মেঘদূতের মর্ত্য আগমন

হেমেন্দ্রকুমার রায়

মেঘদূতের মর্তে আগমন

হেমেন্দ্রকুমার রায়

অলৌকিক রহস্য

সেদিন সকাল-বেলায় কমল যখন নিজের পড়বার ঘরে সবে এসে বসেছে, হঠাৎ তার চাকর ঘরে ঢুকে খবর দিলে, 'বাবু, একটা লোক আপনাকে এই চিঠিখানা দিয়ে গেল।'

কমল চিঠিখান খুলে পড়লে, তাতে শুধু লেখা আছে—

'প্রিয় কমল,
শীঘ্র আমার বাড়িতে এস সাক্ষাতে সমস্ত বলব। ইতি—

বিনয় মজুমদার।'

বিনয়বাবুর সঙ্গে কমলের আলাপ হয় মধুপুরে বেড়াতে গিয়ে। কমলের বয়স উনিশ বৎসর, সে কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। বিময়বাবুর বয়স পঁয়তাল্লিশ। কিন্তু বয়সে এতখানি তফাৎ হলেও, দুজনের মধ্যে আলাপ খুব জমে উঠেছিল। বিনয়বাবুর স্বভাবটা ছিল এমন সরল যে, বয়সের তফাতের জন্যে কারুর সঙ্গে তাঁর ব্যবহারের কিছুমাত্র তফাৎ হত না ।

কমলের সঙ্গে বিনয়বাবুর আলাপ এত ঘনিষ্ঠ হবার আরও একটা কারণ ছিল। বিনয়বাবু সরল হলেও তার প্রকৃতি ঠিক সাধারণ লোকের মতন নয়। দিন-রাত তিনি পুঁথিপত্র আর লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকেন, সংসারের আর কোন ধার বড় একটা ধারেন না। তাঁর বাড়ীর ছাদের উপরে আকাশ-পরিদর্শনের নানারকম দূরবীন ও যন্ত্র আছে,—গ্রহ-নক্ষত্রের খবর রাখা তার একটা মস্ত বাতিক। এসম্বন্ধে তিনি এমন সব আশ্চর্য গল্প বলতেন, তার অন্যান্য বন্ধুরা যা

গাঁজাখুরি বলে হেসেই উড়িয়ে দিতেন, এমন কি অনেকে তাকে পাগল বলতেও ছাড়তেন না ।

কমল কিন্তু তার কথা খুব মন দিয়ে শুনত। কলের মত শ্রোতাকে পেয়ে বিনয়বাবুও ভারি খুসি হয়েছিলেন এবং এইজন্যেই কমলকে তাঁর ভারি ভালো লাগত। নিজের নতুন নতুন জ্ঞানের কথা কমলের কাছে তিনি খুলে বলতেন, কমলও তা ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করত না।

আজ সকালে বিনয়বাবুর চিঠি পেয়ে কমল বুঝল যে, তিনি নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কথা তাকে বলতে চান। সে তখনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। .

বিনয়বাবুর বাড়ীতে গিয়ে উপরে উঠে কমল দেখলে, তিনি তাঁর লাইব্রেরি-ঘরের ভিতরে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিনয়বাবু দেখতে ফর্সা এবং মাথায় মাঝারি হলেও তার দেহখানি এমন বিষম চওড়া যে, দেখলেই বোঝা যায়, তার গায়ে জোর আছে অত্যন্ত। তাঁর মাথায় কাঁচা-পাকা চুল,—সে চুলে কখনো চিরুনি-বুরুশ পড়েছে বলে সন্দেহও হয় না। মুখেও কাঁচা-পাকা গোঁফ ও লম্ব দাড়ি।

কমলকে দেখেই বিনয়বাবু বললেন, এই যে ভায়া, আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

কমল বললে, কেন বিনয়বাবু, আপনি কোন নতুন নক্ষত্র আবিষ্কার করেছেন নাকি?

বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বললেন, ‘না হে, না, তার চেয়েও গুরুতর ব্যাপার।

তার চেয়েও গুরুতর ব্যাপার। তবে কি ধুমকেতু আবার পৃথিবীর দিকে তেড়ে আসছে?

তাও নয়।

তাও নয়? কিন্তু আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি বড়ই ভয় পেয়েছেন?

ভয় পাইনি, তবে চিন্তিত হয়েছি বটে ...আচ্ছা, আগে এই খবরের কাগজখানা পড়ে দেখ,—এই, এই নীল পেন্সিলে দাগ দেওয়া জায়গাটা —এই বলে বিনয়বাবু কমলের হাতে একখানা বাংলা খবরের কাগজ এগিয়ে দিলেন।

কাগজের একটা কলমের চারপাশে নীল পেন্সিলের মোটা দাগ টানা রয়েছে । কমল পড়তে লাগল—

অলৌকিক কাণ্ড।

ভূত, না, মানুষের অত্যাচার?

কলিকাতার অদূরবর্তী বিলাসপুর গ্রামে সম্প্রতি নানারূপ আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতেছে, পুলিশ অনেক অত্যাচার করিয়াও কিছুই কিনারা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

আজ ঠিক একমাস আগে প্রথম ঘটনা ঘটে। বিলাসপুরের জমিদারের একখানি ছোট স্টীমার গঙ্গার ঘাটে বাঁধা ছিল। হঠাৎ একদিন সকালে দেখা গেল, স্টীমারখানি অদৃশ্য হইয়াছে। স্টীমারে কয়েকজন খালাসি ছিল, তাহারাও নিরুদ্দেশ। পুলিশের বহু অনুসন্ধানেও স্টীমারের কোন সন্ধান মিলে নাই।

তার পরের ঘটনা আরো বিস্ময়কর। বিলাসপুরের শীতলাদেবীর মন্দিরের সামনে একটি বহু-পুরাতন সুবৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। স্থানীয় লোকের বলে, বটগাছটির বয়স দেড়শত বৎসরের চেয়েও বেশী। এতবড় বটগাছ এ অঞ্চলে আর দ্বিতীয় ছিল না। গত ৩রা কার্তিক সোমবার সন্ধ্যাকালে এই বটগাছের তলায় কৃষ্ণযাত্রার অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, সমগ্র বটগাছটি রাত্রের

মধ্যেই ডাল-পালা-শিকড়-শুদ্ধ কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। বটগাছের চিহ্নমাত্র ও সেখানে নাই, গাছের উপরে একদল বানর বাস করিত, তাহাদেরও কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। যেখানে বটগাছ ছিল, সেখানে একটি প্রকাণ্ড গর্ত হাঁ-হাঁ করিতেছে, দেখিলে মনে হয়, যেন এক বিরাট-দেহ দানব বটগাছটিকে শিকড় শুদ্ধ উপড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।

তৃতীয় ঘটনাটিও কম আশ্চর্য নয়। বিলাসপুর স্টেশনে একখানা রেলগাড়ীর ইঞ্জিন লাইনের উপর দাঁড় করানো ছিল। গত ১৩ই কার্তিক তারিখে রাত্রি বারোটার সময় স্টেশন-মাস্টার স্বয়ং ইঞ্জিনখানিকে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু রাত্রি একটার পর থেকে ইঞ্জিনখানিকে আর পাওয়া যাইতেছে না। ইঞ্জিনে আগুন ছিল না, সুতরাং তাহাকে চালাইয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব। তার উপরে সমস্ত লাইন তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ইঞ্জিনের কোন সন্ধান মিলে নাই।

এসব কোন বদমাস বা চোরের দলের কাজ হইতে পারে না। তাহা হইলে পুর্বোক্ত স্টীমার বা বটগাছ বা ইঞ্জিনের কোন না কোন খোঁজ নিশ্চই পাওয়া যাইত। অতএব অতবড় একটা বটগাছ শিকড়শুদ্ধ উপড়াইয়া ফেলিতে যে কত লোকের দরকার, তা আর বুঝাইয়া বলিবার দরকার নাই—মোট কথা, সেটা একেবারেই অসম্ভব। এসব কাজ এতটা চুপি চুপি, এত শীঘ্র করাও চলে না। অথচ এমনি সব কাণ্ড ঘটিতেছে। এর কারণ কী?

বিলাসপুরের বাসিন্দারা এইসব অলৌকিক ব্যাপারে যে যারপর-নাই ভয় পাইয়াছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। সন্ধ্যার পর গ্রামের কেউ আর বাহির হয় না। চৌকিদারও পাহারা দিতে চাহিতেছে না—সকলেই বলিতেছে, এসব দৈত্য-দানবের কাজ। রাত্রে অনেকেই নাকি একরকম অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পায়—সে শব্দ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়। কোন কোন সাহসী লোক জানলায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছে বটে, কিন্তু কিছুই দেখিতে পায় নাই। তবে তাহারা সকলেই এক আশ্চর্য কথা বলিয়াছে শব্দটা যখন খুবই স্পষ্ট

হইয় উঠে, তখন চারিদিকে নাকি বরফের মত কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে থাকে। এ শব্দ কিসের এবং এ ঠাণ্ডা বাতাসের গুপ্ত রহস্যই বা কী?

আমরা অনেক রকম আশ্চর্য ঘটনার কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এমন ব্যাপার আর কখনো শুনি নাই। এ ঘটনাগুলি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, সে বিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা স্বয়ং ঘটনাস্থলে গিয়া সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছেন । যাহাদের বিশ্বাস- হইবে না, তাহারাও নিজের দেখিয়া আসিতে পারেন।

শব্দ ও ঠাণ্ডা বাতাস

খবরের কাগজখানা টেবিলের উপরে রেখে কমল খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

বিনয়বাবু তার মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, সমস্ত পড়লে তো?

কমল বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কী বুঝলে?

ঘটনাগুলো যদি সত্যি হয়, তাহলে এ সব ভুতুড়ে ব্যাপার বলে মানতে হবে বৈকি।

বিনয়বাবু ঘাড় মেড়ে বললেন, প্রথমত, আমি ভূত মানি না। দ্বিতীয়ত, ভূতে যে একদল খালাসি সমেত স্টীমার, ইঞ্জিন আর একদল বানর শুদ্ধ বটগাছ একেবারে বেমালুম হজম করে ফেলতে পারে এমন গল্প কখনো গাঁজাখোরের মুখেও শোনা যায় না।

কমল বললে, তবে কি এ সমস্ত আপনি মানুষের কাজ বলে মনে করেন?

বিনয়বাবু বললেন, মানুষ! মানুষের সাধ্য নেই যে ঘাসের গোছার মত দেড়শো বছরের বটগাছ উপড়ে ফেলবে, খেলার পুতুলের মতন স্টীমার বা ইঞ্জিন তুলে নিয়ে যাবে। বিশেষ, তাহলে ঐ বটগাছ, স্টীমার বা ইঞ্জিনের কোন-না-কোন খোঁজ নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। এই ইংরেজ রাজত্বে একখানা ছোট গয়না কেউ চুরি করে লুকিয়ে রাখতে পারে না, আর অত বড় বড় মালের যে কোন পাত্তাই মিলছে না, তাও কি কখনো সম্ভব হয়? স্টীমারের খালাসির আর গাছের বানরগুলোই বা কোথায় যাবে? তারপর, এই শব্দ আর ঠাণ্ডা বাতাস। এরই বা হদিশ কী? কেন শব্দ হয়, কেন ঠাণ্ড বাতাস বয়? কমল বললে, তাহলে আপনি কী মনে করেন? এসব যদি ভূত বা মানুষের কাজ না হয়—

বিনয়বাবু বাধা দিয়ে বললেন, ‘কমল, ভূত কি মানুষের কথা এ সম্পর্কে একেবারে ভুলে যাও। এ এক এমন অজ্ঞাত শক্তির কাজ, আমাদের পৃথিবীতে যার তুলনা নেই। সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা যে শক্তির সন্ধানের জন্যে এতকাল ধরে চেষ্টা করছেন, আমাদের বাংলা দেশেই তার প্রথম লীলা প্রকাশ পেয়েছে ... কমল, তুমি জান না, আমার মনে কী আনন্দ হচ্ছে।

কমল কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চুপ করে থেকে বললে, বিনয়বাবু, আপনার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কী বলতে চান?

বিনয়বাবু কয় পা এগিয়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন তারপর খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললেন, ‘কমল, আজ বৈকালেই আমি বিলাসপুরে রওনা হব। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে?

কমল বললে, আমরা সেখানে গিয়ে কী করব?

বিনয়বাবু বললেন, ‘ভয় পেও না । ভয় পেলে মানুষ নিজের মনুষ্যত্বের মর্যাদা রাখতে পারে না। বিলাসপুরে যেসব ঘটনা ঘটছে তা এক আশ্চর্য আবিষ্কারের সূচনা মাত্র। শীঘ্রই এর চেয়ে বড় বড় ঘটনা ঘটবে, আর তা ঘটবার আগেই আমি ঘটনাক্ষেত্রে হাজির থাকতে চাই।

কমল বললে, বিনয়বাবু, আমি ভয় পাইনি। আমি খালি বলতে চাই যে, পুলিশ যেখানে বিফল হয়েছে, আমরা সেখানে গিয়ে কী করব?

বিনয়বাবু বললে, পুলিশ তো বিফল হবেই, এ রহস্যের কিনার করবার সাধ্য তো পুলিশের নেই। বাংলা দেশে এখন একমাত্র আমিই এ ব্যাপারের গুপ্ত কথা জানি—আমার এতদিনের আলোচনা কি ব্যর্থ হতে পারে? এখন আমার প্রশ্নের জবাব দাও। আমার সঙ্গে আজ কি তুমি বিলাসপুরে যাবে?

কমল বললে, যাব।

নতুন পরিচয়

বিনয়বাবু আর কমল যখন বিলাসপুরে গিয়ে হাজির হলেন, তখন বিকাল বেলা।

বিনয়বাবু বললেন, কমল এখানে আমার এক বন্ধুর বাড়ী আছে। তার বাড়ীতে গিয়ে উঠলে পরে তিনি আমাদের খুব আদরযত্ন করবেন বটে, কিন্তু কোন খবর না দিয়ে হঠাৎ গিয়ে পড়লে তার অসুবিধে হতে পারে।

কমল বললে, কিন্তু সেখানে না গিয়েও তো উপায় নেই। রাত্রে একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই তো দরকার।

বিনয়বাবু হেসে বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়! আমরা কি আর মাঠে শুয়ে রাত কাটাব? এখানে ডাকবাংলো আছে; সেখানে আজকের রাত কাটাতে তোমার কোন আপত্তি নেই তো?

কমল বললে, কিছু না। বরং অচেনা লোকের বাড়ীর চেয়ে ডাকবাংলোই ভালো।

স্টেশনের কাছেই ডাকবাংলো। দু'জনে ডাকবাংলোর হাতার ভিতরে গিয়ে ঢুকতেই সেখানকার চাকর এসে তাদের সেলাম করলে।

বিনয়বাবু বললেন, এ বাংলো কি তোমার জিন্মায় আছে?

সে বললে, 'হ্যাঁ, কর্তা-বাবু?

তোমার নাম কী?

'আজ্ঞে, অছিমুদ্দি।

দেখ আছিমুদ্দি, আজ আমরা এখানে থাকব। এই ব্যাগটা তোমার কাছে রাখ, আর আমাদের দু'জনের জন্যে রাত্রের খাবারের ব্যবস্থা কর—মুর্গির ঝোল চাই, বুঝলে? এই নাও টাকা। আমরা ততক্ষণে একটু ঘুরে আসি।

বিনয়বাবু কমলের হাত ধরে বাংলোর হাত থেকে আবার বেরিয়ে পড়লেন।

কমল বললে, আমরা কোথায় যাচ্ছি, বিনয়বাবু?

বিনয়বাবু বললেন, শীতলার মন্দিরে। বটগাছের ব্যাপারটা সত্যি কি না, আগে দেখে আসা দরকার।

বিনয়বাবু বিলাসপুরে আগেও বারকয়েক এসেছিলেন, কাজেই পথ-ঘাট তার জানা ছিল। মিনিট পাঁচেক পরেই তারা শীতলার মন্দিরের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

বিনয়বাবু বললেন, কমল, সত্যিই তো বটগাছটা নেই দেখছি। সে গাছটা আগেও আমি দেখেছি,—প্রকাণ্ড গাছ। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিখ্যাত বটগাছ দেখেছ তো? এ গাছটি তার চেয়ে কিছু ছোট হলেও এত-বড় গাছ বাংলা দেশে আর কোথাও দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। অথচ দেখ, সেই গাছের বদলে এখন শুধু একটা গর্ত রয়েছে।

কমল অবাক হয়ে দেখলে, তার সামনে মস্ত বড় একটা গর্ত— তার ভিতরে অনায়াসে শতাধিক মানুষকে কবর দেওয়া যায়। বটগাছটা যে কত বড় ছিল কমল এতক্ষণে তা আন্দাজ করতে পারলে। অথচ এত বড় একটা গাছকেই সকলের অজান্তে রাতারাতি উড়িয়ে নিয়ে গেছে! মানুষের পক্ষে এমন কাজ অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব

মন্দিরের ভিতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল। বিনয়বাবু এগিয়ে গিয়ে তাকে একটি প্রণাম করে বললেন, আপনি বোধহয় এই শীতলা-দেবীর সেবাইত?

হ্যাঁ, বাবা।

এখানে নানারকম আশ্চর্য কাণ্ড-কারখানা হচ্ছে শুনে আমরা কলকাতা থেকে দেখতে এসেছি। আচ্ছা, যে রাতে বটগাছটি অদৃশ্য হয়, সে রাতে আপনি কোথায় ছিলেন?

এই মন্দিরের পাশেই আমার ঘর। আমি এইখানেই ছিলুম।

অথচ কিছুই টের পাননি?

টের যে ঠিক পাইনি, তা নয়; তবে আসল ব্যাপারটা তখন বুঝতে পারিনি।

কী রকম?

অনেক রাতে হঠাৎ কি-রকম একটা শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তার পরেই ঝড়ে গাছ দোলার মত আওয়াজ শুনলুম —সঙ্গে সঙ্গে একটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা জানলা দিয়ে আমার ঘরে ঢুকে পড়ল, আর বটগাছের বদরগুলো কাৎরে চ্যাঁচাতে লাগল। ঝড় উঠেছে ভেবে তাড়াতাড়ি আমি জানলা বন্ধ করে দিলুম–তার পরেই সব চুপচাপ। সকালে উঠে দেখি, বটগাছটা আর নেই।

'তাহলে আপনি কি মনে করেন যে, ঝড় এসেই বটগাছটিকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে?

না, না, তা কী করে হবে? এত-বড় বটগাছ উড়িয়ে নিয়ে যাবে, এমন প্রচণ্ড ঝড় উঠলে গাঁয়ের ভিতরে নিশ্চয়ই আরো অনেক গাছপালা তছনছ হত, অনেক ঘর-বাড়ী পড়ে যেত। কিন্তু আর কোথাও কিছু হল না, উড়ে গেল শুধু এই বটগাছটা।

তাহলে আপনি কি বলতে চান যে—

লোকটি বাধা দিয়ে বললে, আমি আর কিছু বলতে চাই ন। বাবা, এসব কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতেও আমার ভয় হয়,— বলতে বলতে সে আবার মন্দিরের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিনয়বাবু ফিরে বললেন, চল কমল, আমরা একবার গাঁয়ের ভিতরটা ঘুরে আসি।

দু-জনে আবার অগ্রসর হলেন। বিলাসপুর গ্রামখানি বেশ বড় —তাকে শহর বললেও চলে। পথে পথে ঘুরে, নানা লোককে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেও বিনয়বাবু আর কোন নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে পারলেন না। তবে এটুকু বেশ বোঝা গেল, খবরের কাগজের কোন কথাই মিথ্যা নয়।

সন্ধ্যার মুখে তারা যখন আবার ডাকবাংলোর দিকে ফিরলেন, তখন বিনয়বাবু লক্ষ্য করলেন যে, গ্রামখানি এর মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। পথে আর মানুষ নেই, অধিকাংশ ঘর-বাড়ীরই দরজাজানলা বন্ধ। এখানকার বাসিন্দারা যে খুব বেশী ভয় পেয়েছে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

বাংলোর বারান্দায় উঠে বিনয়বাবু দেখলেন, সেখানে দুটি যুবক দু-খানা চোয়ারের উপর বসে আছে। তার মধ্যে একটি যুবকের দেহ যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, দেখলেই বুঝতে দেরি লাগে না যে, তার দেহে অসুরের মতন ক্ষমতা।

তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সেই লম্বা-চওড়া যুবকটি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন করে বললে, 'আজ বৈকালে আপনারাই কি এসেছেন?

হ্যাঁ

তাহলে আমরাও আজ এখানে আপনাদের সঙ্গী হতে চাই। আপনার কোন আপত্তি নেই তো?

না, না, আপত্তি আবার কিসের? বেশ তো একসঙ্গে সবাই মিলে থাকা যাবে। আপনার কোথা থেকে আসছেন?

কলকাতা থেকে। খবরের কাগজে একটা ব্যাপার পড়ে দেখতে এসেছি?

ও, তাহলে আপনারাও আমাদেরই দলে? আমরাও ঐ উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। আপনাদের নাম জানতে পারি কি?

আমার নাম শ্রীবিমলচন্দ্র রায়, আর আমার ঐ বন্ধুটির নাম শ্রীকুমারনাথ সেন।

বিনয়বাবু বললেন, বিমলবাবু, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তো?

বিমল বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার চাকর রামহরিকে বাজারে পাঠিয়েছি, ঐ যে, সে ফিরছে। চ্যাঙারি হাতে করে একটি লোক বাগান থেকে বারান্দায় এসে উঠল, তার সঙ্গে এল ল্যাজ নাড়তে নাড়তে প্রকাণ্ড একটা কুকুর।

বিনয়বাবু বললেন, ও কুকুরটা কার? কামড়াবে না তো?

কুমার বললে, না, না, কামড়াবে না, বাঘা বড় ভালো কুকুর।

কমল এতক্ষণ চুপ করে কথাবার্তা শুনছিল। এখন সে বললে, বিমলবাবু, আপনাদের নাম আর ঐ কুকুরের নাম শুনে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।

বিমল বললে, কী কথা?

কমল একটু ইতস্তত করে বললে, "যকের ধন" বলে আমি একটা উপন্যাস পড়েছিলুম, তাতেও বিমল, কুমার, রামহরি আর বাঘা কুকুরের নাম আছে। কী আশ্চর্য মিল!

বিমল একবার কুমারের মুখের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হেসে বললে, মিল দেখে আশ্চর্য হবেন না। আমরা সেই লোকই বটে।

বিস্ময়ে হতভম্বের মত কমল হাঁ করে খানিকক্ষণ বিমলের মুখের পানে তাকিয়ে রইল; তারপর বলে উঠল, তাও কি সম্ভব?

বিমল তেমনি হাসি-মুখে বললে, সম্ভব নয় কেন?

কমল বললে, তার হচ্ছে উপন্যাসের লোক, আর আপনার যে সত্যিকারের মানুষ।

বিমল বললে, "যকের ধন" যে সত্যিকারের ঘটনা; তা মিথ্যা বলে ভাবছেন কেন?

সত্যি ঘটনা। তাহলে আপনারা কি সত্যি-সত্যিই খাসিয়া পাহাড়ের বৌদ্ধমঠে গিয়েছিলেন?

নিশ্চয় কিন্তু সে আজ পাঁচ-ছয় বছর আগেকার কথা, সেসব বিপদের কথা এখন আমাদের কাছে স্বপ্ন বলে মনে হয়।

পুকুর চুরি

খাওয়া-দাওয়ার পর বিনয়বাবু যকের ধনের গল্পটি বিমলের মুখ থেকে আগাগোড়া শ্রবণ করলেন। তারপর আশ্চর্য স্বরে বললেন, আপনারা এই বয়সেই এমন-সব বিপদের মধ্যে পড়েও বেঁচে আছেন! ধন্য।

বিমল বললে, বিনয়বাবু, বিপদ আমি ভালবাসি, বিপদকে আমি খুঁজে বেড়াই; আর আজ এই বিলাসপুরেও আমরা এসেছি নতুন কোন বিপদেরই সন্ধানে।

বিনয়বাবু বললেন, আপনার সাহসী লোক বটে।

কুমার বললে, কিন্তু এখানে এই যে সব ঘটনা ঘটছে, আমরা তো তার কোন হদিশ খুঁজে পাচ্ছি না। এসব কি ভুতুড়ে কাণ্ড।

বিনয়বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, না। তবে, আমার সন্দেহ যদি সত্য হয়, তাহলে—

বিমল অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আপনি কী সন্দেহ করেন বিনয়বাবু?

বিনয়বাবু বললেন, এখন বলব না, আরো দু-চারটে প্রমাণ দরকার, নইলে আপনারাই হয়ত বিশ্বাস করবেন না। অনেক রাত হল, আমুন—এবারে নিদ্রালোকে গমন করা যাক?

গভীর রাত্রে হঠাৎ একসঙ্গে সকলের ঘুম ভেঙে গেল।

কমল লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, উঃ, কী শীত!

কুমার বললে, জানলা দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া আসছে—বাইরে ঝড় উঠেছে, —বলেই সে উঠে পড়ে জানলা বন্ধ করে দিতে গেল।

বিনয়বাবু বললেন, দাঁড়ান কুমারবাবু, জানলা বন্ধ করবেন না?

ঝড় উঠেছে যে!

না, ঝড় ওঠেনি, দেখছেন না, বাইরে ফুটফুটে চাঁদের আলো?

তবে ও শব্দ কিসের?

সকলে কান পেতে শুনলে, বাইরে থেকে একটা অদ্ভূত-রকম শব্দ আসছে—যেন কারা লক্ষ-লক্ষ পেন্সিল ঘর্ষণ করছে।

বিনয়বাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, ও ঝড়ের শব্দ নয়।

বিমল বললে, তবে?

সেই রহস্যই তো জানতে চাই, বলেই বিনয়বাবু এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঘা ঘরের ভিতর থেকে এক লাফে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সকলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। চারিদিকে পরিষ্কার চাদের আলো, আকাশে মেঘের নামমাত্র নেই। তবে ঝড়ের মতন ঠাও-হাওয়া বইছেই বা কেন, আর ঐ রহস্যময় শব্দটাই বা আসছে কোত্থেকে? .

নিয়বাবু বললেন, শব্দটা হচ্ছে উপর দিকে —তার কথা শেষ হতে-না-হতেই খানিক তফাত থেকে হঠাৎ মানুষের তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল—তার পরেই কুকুরের চীৎকার।

কুমার বললে, এ যে বাঘার গলা!

রামহরি বললে, বাঘা বোধহয় কারুকে কামড়ে ধরেছে।

মানুষ আর কুকুরের চীৎকার আরো বেড়ে উঠল।

কুমার বললে, না রামহরি, বাঘা কারুকে কামড়ায়নি,—তার চীৎকার শুনে মনে হচ্ছে, সে যেন ভয়ানক ভয় পেয়েছে।

বিমল বললে, চল, চল, এগিয়ে দেখা যাক।

যেদিক থেকে সেই মানুষ আর কুকুরের আর্তনাদ আসছে, সকলে বেগে সেইদিকে ছুটে গেল। কিন্তু কই, কোথাও তো কিছুই নেই ।

আর্তনাদ তখনো হচ্ছে, কিন্তু অতি অস্পষ্ট—যেন অনেক দূর থেকে আসছে।

কুমার চেঁচিয়ে ডাকলে—বাঘা, বাঘ, বাঘা! কোথায় বাঘা? নিয়বাবু উপর-পানে হাত তুলে বললেন, আকাশে?

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই তো! আকাশ থেকেই তো আর্তনাদ আসছে, এ কী কাণ্ড?

রামহরি বললে, রাম, রাম, রাম, রাম। বাঘাকে পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

কুমার কাতরভাবে বললে, আমার এতদিনের কুকুর।

সকলে সভয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। বিনয়বাবু বললেন, ঐ যেন কী দেখা যাচ্ছে না?

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, ঠিক যেন ছুটে কালো ফোটা.ঐ যাঃ, মিলিয়ে গেল।

বিনয়বাবু আরো আশ্চর্য ব্যাপার দেখলেন,—আকাশের বুকে ছায়ার মত অস্পষ্ট কি-একটা প্রকাণ্ড জিনিস। কিন্তু সে ব্যাপার আর প্রকাশ না করে তিনি শুধু বললেন, আর সেই শব্দ নেই, আর্তনাদও শোনা যাচ্ছে না—ঠাণ্ড বাতাসও বইছে না।

কমল বললে, এমন ব্যাপারের কথাও তো কখনো শুনিনি।

এর মানে কী বিনয়বাবু? আপনি কি এখনো বলতে চান যে, এসব ভৌতিক কাণ্ড নয়?

বিনয়বাবু কোন জবাব দিলেন না, ঘাড় হেঁট করে কি ভাবতে লাগলেন।...খানিকক্ষণ পরে পথের পাশে তাকিয়ে সচমকে তিনি বললেন, ও কী ও!

সকলেই সেদিকে তাকালে, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না। পথের পাশে খালি পুকুর রয়েছে, কিন্তু তার জল প্রায় সমস্তই শুকিয়ে গিয়েছে।

বিনয়বাবুকে তখনো বিস্ফারিত চোখে সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিমল জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কী দেখছেন বিনয়বাবু?

বিনয়বাবু বললেন, ঐ পুকুরটা।

বিমল কিছুই বুঝতে না পেরে বললে, 'হ্যাঁ, পুকুরে জল নেই ; তাতে কী হয়েছে?

বিনয়বাবু বললেন, কিন্তু আজ বৈকালে আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে ঐ পুকুরটার কাণায় কাণায় জল টলমল করছে।

বিনয় বললে, আপনি ভুল দেখেছেন।

না, আমি ঠিক দেখেছি।

তাহলে এর মধ্যে এক-পুকুর জল কোথায় গেল?

ঐ আকাশে।

এই অদ্ভুত উত্তরে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। বিমল বললে, এক-পুকুর জল আকাশে উড়ে গেছে? না, না, এটা একেবারেই অসম্ভব।

বিনয়বাবু গম্ভীরভাবে বললেন, কাল সকালে আমি সব কথা খুলে বলব। তখন আপনারা বুঝতে পারবেন, এর মধ্যে কিছুই অসম্ভব নেই। এখন ডাকবাংলোয় ফিরে যাওয়া যাক।

কুমার মলিন মুখে বললে, কিন্তু আমার বাঘা...

বিনয়বাবু বললেন, সে আর ফিরবে না। শুধু বাঘা নয়, আমরা মানুষের আর্তনাদও শুনেছি, একজন মানুষও নিশ্চয় বাঘার সঙ্গী হয়েছে।

বিনয়বাবুর কথাই সত্য। পরদিন শোনা গেল, বিলাসপুরের একজন রাতের চৌকিদারের কোনই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা

বিমল বললে, দেখুন বিনয়বাবু, আপনি আমাদের চেয়ে বয়সে ঢের বড়। কাজেই এবার থেকে "তুমি" বলেই ডাকবেন।

বিনয়বাবু হেসে বললেন, আচ্ছা বিমল, তাই হবে।

বিমল বললে, তাহলে এইবারে এখানকার আশ্চর্য ব্যাপারের গুপ্ত কথা আমাদের কাছে খুলে বলুন!

বিনয়বাবু খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, দেখ আমি যা বলব, তা শুনলে তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা, জানি না। কিন্তু বিশ্বাস কর আর নাই কর, এটুকু নিশ্চয়ই জানো যে, আমি একটিও মন-গড়া বাজে কথা বলব না, কারণ আমার প্রত্যেক কথাটিই বিজ্ঞানের মতে সত্য বলে প্রমাণ করা শক্ত হবে না। এমন কি, য়ুরোপ-আমেরিকার বড়-বড় পণ্ডিত আর বৈজ্ঞানিকরা এই বিষয় নিয়ে এখন যথেষ্ট মাথা ঘামাচ্ছেন। আমিও এই বিষয় নিয়ে আজ অনেক বৎসর ধরে আলোচনা করে আসছি—

বিমল বাধা দিয়ে বললে, কিন্তু এখানকার এইসব অলৌকিক কাণ্ডের সঙ্গে বিজ্ঞানের কী সম্পর্ক থাকতে পারে, বিনয়বাবু?

বিনয়বাবু হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে বললেন, বিমল ভায়া, এত আল্পেই ব্যস্ত হয়ে উঠে না। আগে মন দিয়ে আমার কথা শোন...তোমরা জান তো, সোম, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি অনেক গ্রহ আছে?

আজ্ঞে হ্যা। আর এও জানি যে, আমাদের পৃথিৰীও একটি গ্রহ। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে যে গ্রহ আছে, তার নাম মঙ্গল বা মার্স।

হুঁ। য়ুরোপ-আমেরিকার বড় বড় মানমন্দিরে আজকাল এমন সব প্রকাণ্ড দূরবীন ব্যবহার করা হয় যে, ঐসব গ্রহ-উপগ্রহ হাজার হাজার মাইল দূরে

থাকলেও, আমাদের চোখের সামনে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পণ্ডিতেরা অনেক আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অন্যত কোন কোন গ্রহে পৃথিবীর মত জীব বাস করে। এই সিদ্ধান্তের কারণও আছে। মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে বলে, দূরবীন দিয়ে তার ভিতরটাই বেশী করে দেখবার সুবিধে হয়েছে। পণ্ডিতেরা দেখেছেন যে মঙ্গল গ্রহের ভিতরটা প্রায় মরুভূমির মত, হয়ত প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে আর জলাভাবে সেখানে উদ্ভিদ জন্মানে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এই সঙ্গে আরো একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে। মঙ্গল গ্রহের মধ্যে শত শত ক্রোশ ব্যাপী এমন প্রকাণ্ড খাল আছে, যার তুলনা পৃথিবীতেও নেই। সে খাল আবার এমন সোজাসুজি কাটা যে, তা কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারে না।

বিমল অত্যন্ত কৌতুহলী হয়ে বললে, অর্থাৎ সে খাল কৃত্রিম?

হ্যাঁ। আর এইখানেই একটা মস্ত আবিষ্কারের সূত্রপাত। আরো দেখা গেছে, সে খাল যত দূর অগ্রসর হয়েছে ততদূর পর্যন্ত দু-পাশের জমি সবুজ—অর্থাৎ গাছপালায় ভরা। এখন বুঝে দেখ, কৃত্রিম খাল কখনও আপনা-আপনি প্রকাশ পায় না। নিশ্চয়ই তা মানুষ বা মানুষের মত কোন জীবের হাতে কাটা। আর এমন এক মরুভূমির মতন দেশে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শত শত ক্রোশ ব্যাপী কৃত্রিম খাল কেটে, চাষ-আবাদ করে যে জীব বেঁচে আছে, তারা যে খুব চালাক ও সভ্য, তাতেও আর কোনই সন্দেহ নেই।

কমল বললে, বিনয়বাবু, এসব কথা আপনার মুখে আমি আরো অনেকবার শুনেছি। কিন্তু বিলাসপুরের এই ভূতুড়ে কাণ্ডের সঙ্গে আপনি মঙ্গল গ্রহকে টেনে আনছেন কেন?

বিনয়বাবু বললেন, ক্রমে বুঝবে, আগে সব শোন। বৎসরের একটা ঠিক সময়ে, মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর অনেকটা কাছে আসে। কিছুদিন আগে কলকাতার সমস্ত খবরের কাগজে তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ যে, পুথিবীর বড় বড় বেতারবার্তা পাঠাবার স্টেশনে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। বেতারযন্ত্রে এমন সব অদ্ভুত

বার্তার সঙ্কেত এসেছিল, যার অর্থ কেউ বুঝতে পারেনি। সেসব সঙ্কেত কোথা থেকে আসছে, তাও জানা যায়নি। ঠিক সেই সময়েই কিন্তু মঙ্গল গ্রহ এসেছিল পৃথিবীর খুব কাছেই। কাজেই বৈজ্ঞানিকরা স্থির করতে বাধ্য হলেন যে, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারাই পৃথিবীর লোকের সঙ্গে কথা কইবার জন্যে বেতার-বার্তা পাঠাচ্ছে। কিন্তু তাদের বার্তার স:ঙ্কত আলাদা বলেই আমরা তা বুঝতে পারি না।

বিমল বললে, 'আজ্ঞে, হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে বটে, কিছুদিন আগে এমনি একটা ব্যাপার নিয়ে খবরের কাগজে মহা আন্দোলন চলেছিল।

বিনয়ুবাবু বললেন, তাহলে সংবাদপত্রে আরো একটা খবর তোমরা পড়েছ বোধহয়? আমেরিকার একজন সাহসী বৈজ্ঞানিক রকেটে চড়ে মঙ্গল গ্রহে যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

কুমার আশ্চর্য স্বরে বললে, রকেটে চড়ে?

হ্যাঁ। কিন্তু এ তোমাদের সাধারণ বাড়িওয়ালার হাতে তৈরী ছেলেখেলার রকেট নয়—তার চেয়ে হাজার হাজার গুণ বড়। তার মধ্যে মস্ত এক ধাতু-তৈরী ঘর থাকবে, সে ঘরে থাককেন সেই সাহসী বৈজ্ঞানিক। উপরের ঘরের তলায় থাকবে বারুদের ঘর। মঙ্গল গ্রহ যে সময়ে পৃথিবীর কাছে আসবে, সেই সময়ে এই রকেট ছোড়া হবে। বায়োস্কোপের এক অভিনেতা একটি মাঝারি আকারের রকেটে চড়ে পৃথিবীর এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় নিরাপদে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, এ ব্যাপারটা একেবারেই অসম্ভব নয়।

বিমল বললে,"কিন্তু এ থেকে কী প্রমাণিত হচ্ছে?

এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মঙ্গল গ্রহ আর পৃথিবীর বাসিন্দারা পরস্পরের পরিচয় জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এখন আমি যদি বলি যে, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা আমাদের চেয়ে আরো কিছু বেশি অগ্রসর হয়েছে, অর্থাৎ তার ইতিমধ্যেই পৃথিবী থেকে নানা নমুনা নিয়ে যেতে মুরু করেছে, তাহলে কি অত্যন্ত অবাক হবে?

বিমল, কুমার আর কমল একসঙ্গে সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'অ্যাঁ, বলেন কী,—বলেন কী?

বিনয়বাবু দৃঢ় স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, বিলাসপুরে এই যে সব অলৌকিক কাণ্ড হচ্ছে তা মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দাদের কীর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবীর যা কিছু দেখেছে, পরীক্ষা করবার জন্যে সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে।

বিমল রুদ্ধশ্বাসে বললে, কিন্তু কী উপায়ে?

উপায়ের কথা আমি ঠিক করে কিছু বলতে পারছি না বটে, তবে আমি যা আন্দাজ করেছি, সেটা সম্ভব হলেও হতে পারে।. আমাদের জানা আছে যে পৃথিবীর উপরে মাইল-কয়েক পর্যন্ত বাতাসের অস্তিত্ব, তার পরে আর বাতাস নেই, আছে কেবল শূন্য। এই শূন্যের মধ্যে অন্য অন্য যেসব গ্রহ ঘুরছে, তাদের মধ্যে হয়ত পৃথিবীর মত বায়ুমণ্ডল আছে। কিন্তু পৃথিবী থেকে অন্য গ্রহে, কিংবা অন্য গ্রহ থেকে পৃথিবীতে যেতে আসতে হলে বায়ুহীন শূন্য পার হতে হবে। আমার বিশ্বাস, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা ডুবোজাহাজের মত এয়ার-টাইট বা ছিদ্রহীন এমন কোন ব্যোমযান তৈরী করেছে, যার ভিতরে দরকার-মত বাতাসের কিংবা অক্সিজেন বাষ্পের ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যোমযান চড়ে শূন্য পার হয়ে তারা পৃথিবীর আবহাওয়াতে এসে হাজির হয়েছে।...কাল রাত্রে যখন এখানকার চৌকিদার আর বাঘা আর্তনাদ করেছিল আকাশের দিকে চেয়ে তখন আমি লক্ষ্য করেছিলুম,—অনেক উঁচুতে চাঁদের আলোর মাঝখানে প্রকাণ্ড কি একটা ছায়ার মত ভাসছে—খানিক পরেই আবার তা মিলিয়ে গেল। আমার বিশ্বাস সে ছায়া আর কিছু নয়—মঙ্গল গ্রহের ব্যোমযান।

খানিকক্ষণ সকলেই অভিভূতের মতন স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল। বিনয়বাবু যা বললেন, কেউ তা স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি। অবশেষে বিমল বললে, কিন্তু আমরা মঙ্গল গ্রহের কোন লোককে তো দেখতে পাইনি। তবে

বিলাসপুর থেকে স্টীমার, ইঞ্জিন, বটগাছ, পুকুরের জল আর জীবজন্তু কেমন করে অদৃশ্য হচ্ছে?

বিনয়বাবু বললেন, এ প্রশ্নের নির্ভুল জবাব দেওয়া শক্ত; তবে ঐ রহস্যময় ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রবাহের জন্য আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে। তোমরা কেউ Vacuum Clener দেখেছ?

কুমার বললে, হ্যাঁ, শিয়ালদহ স্টেশনে দেখেছি। একটি যন্ত্রের সঙ্গে লম্বা নল আছে। সেই নলের মুখ ধুলোর উপরে ধরে যন্ত্র চালালেই ভিত্তর থেকে হু-হু করে হাওয়া বেরিয়ে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধুলো নলের ভিতর ঢুকে পড়ে। এই উপায়ে খুব সহজেই ধুলো সাফ করা যায়।

বিনয়বাবু বললেন, খুব সম্ভব মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা এইরকম কোন যন্ত্রের সাহায্যেই পৃথিবীর উপরে অত্যাচার করছে। তবে তাদের এই Vacuum যন্ত্রটি এত বড় ও শক্তিশালী যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্টীমার, ট্রেন ও বটগাছ, এমন কি একপুকুর জল পর্যন্ত তা অনায়াসে শুষে গিলে ফেলতে পারে। আচমকা ঠাণ্ডা হাওয়া বইবার আর কোন কারণ তো আমার মাথায় আসছে না। যন্ত্রটি যখন বায়ুশূন্য হয়, সেই সময়েই চারিদিকে ঠাণ্ড বাতাসের ঝাপটা লাগে। এই আমার মত।

কুমার শোকাচ্ছন্ন স্বরে বললে, তাহলে আমার বাঘাকে আর কখনো ফিরে পাব না?

বিনয়ৰাবু মাথা নেড়ে জানালেন, না।

বিমল চিন্তিতভাবে বললে, বিনয়বাবু, জানি না আপনার কথা সত্য কিনা। কিন্তু আপনার যুক্তি শুনলে এসব ব্যাপার অবিশ্বাস করতেও প্রবৃত্তি হয় না। আচ্ছা, এবিষয় নিয়ে আপনি যখন এত আলোচনা করছেন, তখন বলতে পারেন কি, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দাদের চেহারা কিরকম? তারা কি মানুষেরই মত দেখতে?

বিনয়বাবু বললেন, তা কী করে বলব? তবে তাদের মস্তিষ্ক যে খুব উন্নত, তারা যে যথেষ্ট সভ্য, আর জ্ঞান-বিজ্ঞানেও খাটো নয়, তাদের কাজ দেখে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। পৃথিবীর অবস্থা, জল-মাটি আবহাওয়া আর জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রণালী অনুসারেই আমাদের চেষ্টার। এ-রকম হয়েছে; মঙ্গল গ্রহের ভিতরকার অবস্থা যদি অন্যরকম হয়, তবে সেখানকার জীবের মানুষের চেয়ে বেশি সভ্য আর বুদ্ধিমান হলেও, তাদের চেহারা অন্যরকম হওয়াই সম্ভব।

বিমল কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললে, এবার থেকে এখানে বন্দুক না নিয়ে আমি পথে বেরুব না।

কেন?

দাঁতে দাঁত চেপে বিমল বললে, যদি সুবিধে পাই, বুঝিয়ে দেব যে, মানুষ বড় নিরীহ জীব নয়।

আকাশ থেকে মাংস বৃষ্টি

সেইদিন সন্ধ্যার কিছু আগে বিনয়বাবুর সঙ্গে সকলে বেড়িয়ে বাংলোর দিকে ফিরছিল। গেল রাতের সেই প্রায় শুকনো পুকুরটার কাছে এসে বিনয়বাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পুকুরের দু-দিকে বাধা ঘাট,–কিন্তু জল নেমে যাওয়াতে ঘাটের সব-নিচের শেওলামাখা সিড়ির ধাপ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পুকুরের তলায় এখনো অল্প একটু জল চিকচিক করছে।

বিনয়বাবু যেন আপন আপনি বললেন, যে যন্ত্র দিয়ে এত অল্প সময়ে অতখানি জল শুষে নেওয়া যায়, সে যন্ত্রটা না-জানি কী প্রকাণ্ড । খালি ঠাণ্ডা হাওয়া নয়, এই পুকুর-চুরি দেখেও আমার বিশেষ সন্দেহ হচ্ছে যে, যন্ত্রটি নিশ্চয়ই Vacuum। বিশেষ, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা যে এয়ার-টাইট ব্যোমযানে করে এসেছে, তার আকারও নিশ্চয় সামান্য নয়! নইলে তার ভিতরে স্টীমার, ইঞ্জিন, বটগাছ আর প্রায় একপুকুর জল থাকবার ঠাই হত না।

হঠাৎ উপর থেকে কি কতকগুলো জিনিস ঝপাং করে পুকুরের ভিতরে পড়ল এবং কতকগুলো পড়ল পুকুরের পাড়ের উপরে। সকলে বিস্মিত চোখে উপরদিকে তাকিয়ে দেখলে—কিন্তু সেখানে কিছুই নেই। কেবল অনেক উঁচুতে আকাশের বুকে ছায়ার মত কি যেন একটা জেগে রয়েছে,—কিন্তু সেটা এত অস্পষ্ট যে, তার বিষয়ে জোর করে কিছু বলাও যায় না !

বিনয়বাবু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলে উঠলেন, ‘হায়, হায়, কলকাতা থেকে আসবার সময় একটা ভাল দূরবীন যদি সঙ্গে করে আনতুম, তাহলে এখনি সব রহস্তের কিনারা হয়ে যেত।

কমল বললে, কিন্তু আকাশ থেকে ওগুলো কী এসে পড়ল?

বিমল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, খানিক তফাতেই রাঙা পিণ্ডের মতন কি একটা পড়ে রয়েছে। কিন্তু কাছে গিয়েই সে সভয়ে আবার পিছিয়ে এসে বলে উঠল, বিনয়বাবু!

কী বিমল, ব্যাপার কী?

এ যে মানুষের দেহ!

অ্যাঁ, বল কি!

সকলেই সেই রাঙা পিণ্ডটার দিকে বেগে ছুটে গেল. সামনে সত্যই একটা রক্তমাখা মাংসের স্তুপ পড়ে রয়েছে, অনেক উঁচু থেকে পড়ার দরুন সেটা এমন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে যে সহজে তা মানুষের দেহ বলে চেনাই যায় না । তবে, দেহের কোন-কোন অংশ এখন তার মনুষ্যত্বের অল্প-স্বল্প পরিচয় দিচ্ছে।....

কমল বললে,"লোকটা বোধহয় মঙ্গল গ্রহের উড়োজাহাজ থেকে পালিয়ে আসবার জন্যে লাফিয়ে পড়েছিল।

কুমার একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, আহা বেচারা আমার বাঘাও সেখানে আছে, না জানি সে কী করছে।

কিন্তু বিনয়বাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই মাংস-পিণ্ডের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'না, এই দেহ যার, সে নিজে উপর থেকে লাফিয়ে পড়েনি।

বিমল বললে, তবে?

লাফিয়ে পড়বার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল।

কী করে জানলেন আপনি?

বিনয়বাবু মাংস-পিণ্ডের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, দেখ, এই মড়াটার একটা হাত আর বুকের একটা পাশ এখনো থেতলে গুড়ো হয়ে যায়নি। ভালো করে চেয়ে দেখ দেখি,—কী দেখছ?

বিমল হেঁট হয়ে পড়ে দেখতে লাগল। তারপর বললে, একি, এর দেহের উপরকার ছাল ছাড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

খালি তাই নয়। বুকের আর হাতের উপরকার মাংসও ছুরি দিয়ে কেটে নেওয়া হয়েছে।

কেন বিনয়বাবু?

ভালো করে দেখলে তাও বুঝতে পারবে। দেখ না, মেডিকেল কলেজের ডাক্তারের ঠিক যেভাবে মড়া কাটে, এই দেহটার উপরেও ঠিক সেইভাবেই ছুরি চালানো হয়েছে। বিমল, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা মানুষের শব ব্যবচ্ছেদ করে দেখেছে।

তার মানে?

তারা দেখতে চায়, মানুষ কোন শ্রেণীর জীব। হুঁ, এখন বুঝতে পারছি, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দাদের চেহারা নিশ্চয়ই মানুষের মত নয়, কারণ তা যদি হত তাহলে মানুষের দেহ নিয়ে এভাবে পরীক্ষা করবার আগ্রহ তাদের নিশ্চয়ই থাকত না ...বিমল, কুমার, পৃথিবীতে সত্যই যে মঙ্গল গ্রহের ব্যোমযান এসেছে, আর বিলাসপুরের স্টীমার ইঞ্জিন যে আকাশেই অদৃশ্য হয়েছে, উপর থেকে এই মড়ার আবির্ভাবে তোমরা বোধহয় সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারছি?

বিমল, কুমার ও কমল কেউ কোন জবাব দিলে না; আজ এই চাক্ষুষ প্রমাণের উপর আর কোন সন্দেহ চলে না।

রামহরি বললে, কিন্তু বাবু, পুকুরের ভেতরেও যে এইসঙ্গে কি কতকগুলো এসে পড়েছে! সেগুলো কী, দেখবেন না?

বিনয়বাবু ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন,না রামহরি আর দেখবার দরকার নেই। সেগুলোও হয়ত আর কোন অভাগার দেহ! মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা নিশ্চয় এদের হত্যা করেছে, তারপর পরীক্ষা শেষ করে দেহগুলোকে আবার পৃথিবীতে ফেলে দিয়েছে।

রামহরি বললে, আপনার কথা শুনে তো বাবু আমি কিছুই ঠাউরে উঠতে পারছি না। আকাশে তো দেবতারা থাকেন, তবে কি দেবতারাই পৃথিবীতে

বেড়াতে এসেছেন?—বলে সে আকাশের দিকে মুখ তুলে দেবতাদের ইদ্দেশ্যে ভক্তিভরে বার বার প্রণাম করতে লাগল।

বিমল রেগে বললে, রামহরি, এখান থেকে তুই বিদায় হ। এ সময়ে তোর বোকামি আর ভালো লাগে না।

রামহরি বলল, চটো কেন খোকাবাবু? আমি তো আর তোমাদের মত ত্রিশ্চান নই, রামপাখির ঝোলও খাইনা। ঠাকুর দেবতাকে ভক্তি করা আমি বোকামি বলে মনে করি না।

বিমল চটে গিয়ে বললে, বেশ এবারে দেবতাদের সাড়া পেলেই তোকে সশরীরে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব, আপাতত তুই মুখ বন্ধ কর।

কুমার বললে, কিন্তু বিনয়বাবু, এ যে বড় ভয়ানক কথা। আপনার ঐ মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা পৃথিবী থেকে মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করবে, আর আমরা চুপ করে বসে তাই দেখব? তাদের বাধা দেবার কি কোন উপায় নেই?

বিনয়বাবু বললেন, উপায় একটা করতেই হবে বৈকি। মানুষ এখনো টের পায়নি, তাদের মাথার উপরে কী বিপদের খাড়া ঝুলছে ! আজ যে অত্যাচার খালি বিলাসপুরে হচ্ছে, দু-দিন পরে তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

বিমল বললে, কিন্তু কী উপায় আপনি করবেন?

বিনয়বাবু বললেন, তা আমি এখন বলতে পারি না। তবে, আজকেই আমি আমার মত একটি প্রবন্ধে খুলে লিখব, আর কাল তা সংবাদপত্রে প্রকাশ করব। সকলকে আগে আসল ব্যাপারটা জানিয়ে দেওয়া দরকার,—কারণ আমাদের মত দু-একজনের চেষ্টায় কোনই সুবিধা হবে না, এখন সকলকে একসঙ্গে মিলে-মিশে করতে হবে।

কমল বললে, কিন্তু বিনয়বাবু, দেশের লোকে যদি আপনার কথাকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেয়?

তাহলে তার নিজেরাই মরবে। আমার যুক্তি আর এমন সব চাক্ষুষ প্রমাণ দেখেও যদি কেউ বিশ্বাস না করে, তাহলে আমি নাচার। তবু আমার কর্তব্য আমি করে খালাস হব। এখন চল।

সকলে বাংলোর দিকে ফিরল। যেতে যেতে মুখ তুলে বিমল দেখলে, আকাশের গায়ে সেই অদ্ভূত ছায়াটা এখনো জেগে আছে,— তবে আরো ছোট আরো অস্পষ্ট।

বিমল অবাক হয়ে মনে মনে ভাবতে লাগল-না জানি এমন কী গভীর রহস্য ঐ বিচিত্র ছায়ার আড়ালে লুকানো আছে, যা শুনলে সারা পৃথিবীর বুক ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে যাবে!

বিখ্যাত হওয়ার বিপদ

পরদিনের সকালে খবরের কাগজ আসবামাত্র বিমল ভাড়াতাড়ি সেখানি নিয়ে পড়তে বসল,—কারণ আজকেই বিনয়বাবুর প্রবন্ধটা প্রকাশ হবার কথা।

খবরের কাগজ খুলেই বিমল সর্বপ্রথমে দেখলে, বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে--

বিলাসপুরের নূতন রহস্য !
আকাশ হইতে মানুষের মৃতদেহ পতন!

তারপর গতকল্য বিলাসপুরে যে ঘটনা ঘটেছিল এবং আমরা আগেই যার ইতিহাস দিয়েছি, তার বর্ণনা। তার পরেই আবার বড় বড় অক্ষরে—

বিশেষজ্ঞের বিচিত্র আবিষ্কার
মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা !
পৃথিবীর ভীষণ বিপদ।

শিরোনামার তলায় বিনয়বাবুর প্রবন্ধ। বিনয়বাবু কিছুমাত্র আত্যুক্তি না করে বেশ সরল ও সহজ ভাষায় আপনার মত ব্যক্ত করে গেছেন। তাঁর মতও আমরা আগেই প্রকাশ করেছি, সুতরাং এখানে আর তা উল্লেখ করবার দরকার নেই। প্রবন্ধের শেষে সম্পাদক লিখেছেন– বিনয়বাবু যে আশ্চর্য ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সহজে কল্পনায় আসে না। হয়ত অনেকেই তাঁহার কথাকে

পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, কিন্তু আমরা আপাতত তাহার মত সমর্থন করা ছাড়া উপায়ান্তর দেখিতেছি না। কারণ বিনয়বাবু বহু বৎসর আলোচনা চিন্তা ও বিচারের পর এবং চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব। মঙ্গল গ্রহে জীবের অস্তিত্ব যে বিনয়বাবুর মন-গড়া কথা, তাহাও নহে। যুরোপ আমেরিকার অনেক বড় বড় পণ্ডিত এ ব্যাপারটাকে সত্য বলিয়াই মানিয়া থাকেন। এমন কি বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কারক মার্কনি সাহেবও একবার মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দাদের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং এটা বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বিনয়বাবুর মত যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া বিলাসপুরের আশ্চর্য রহস্যের কিনারা করিবার আর কোন উপায়ও দেখিতেছি না। আসল কথা, এই গুরুতর ব্যাপার লইয়া এখন রীতিমত চিন্তা করা আবশ্যক। কারণ বিনয়বাবু পরিষ্কারভাবেই দেখাইয়াছেন যে, পৃথিবীর মাথার উপরে বিষম এক বিপদের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে,—সময় থাকিতে সাবধান না হইলে এ বিপদ আরে। ভয়ানক রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

বিমল বললে, বিনয়বাবু, সম্পাদক আপনারই মত সমর্থন করেছেন।

বিনয়বাবু বললেন, যার মাথায় এতটুকু যুক্তি আছে, তাকে আমার মত মানতেই হবে।—এই বলে খবরের কাগজখানা নিয়ে তিনি পড়তে বসলেন।

বৈকালে ডাকবাংলোতে লোক আর ধরে না। স্থানীয় জমিদার, মোড়ল ও মাতব্বর ব্যক্তিরা বিলাসপুরের এবং আশপাশের গাঁয়ের লোকজনে ডাকবাংলোর ঘর থেকে বারান্দ পর্যন্ত ভরে গেল। কলকাতার অনেক খবরের কাগজের অফিস থেকেও সাহেব ও বাঙালী প্রতিনিধিরা এলেন। এ অঞ্চলের পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব ও দারোগা প্রভৃতি এসেও ঘরের একুপাশে আসন সংগ্রহ করলেন। সকলেরই ইচ্ছা, বিনয়বাবুর সঙ্গে মঙ্গল গ্রহ নিয়ে আলোচন করা।

বিনয়বাবুর প্রথমটা ভয় ছিল, লোকে তার কথা বিশ্বাস করবে কিনা। কিন্তু এখন দেখলেন, তাঁর উল্টো বিপদ উপস্থিত। সকলের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে তাঁর প্রাণ যায় আর কি।

পুলিশ সাহেব খানিকক্ষণ বিনয়বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন, আচ্ছ বিনয়বাবু, আপনার সন্দেহ যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের কী করা উচিত?

সাহেব বললেন, রাত্রে গাঁয়ে সশস্ত্র সেপাই বসিয়ে রাখব কি? .

কেন?

মঙ্গল গ্রহের উড়োজাহাজ কাছে এলেই সিপাইরা বন্দুক ছুড়বে।

বিনয়বাবু একটু ভেবে বললেন, পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। কিন্তু এই উড়োজাহাজ কিরকম পদার্থ দিয়ে তৈরী তা তো আমি বলতে পারি না । বন্দুকের গুলিতে তার ক্ষতি হতেও পারে, না হতেও পারে।

সন্ধ্যার পরে একে একে সবাই যখন বিদায় নিয়ে চলে গেল, বিনয়বাবু শ্রান্তভাবে বিছানার উপরে শুয়ে পড়লেন।

বিমল হাসতে হাসতে বললে, বিনয়বাবু, একদিনেই আপনি বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন।

বিনয়বাবু হতাশ হয়ে বললেন, বিখ্যাত হওয়ার এত জ্বালা। আমার কী মনে হচ্ছে জানে বিমল? ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

বিমল বললে, ওরা আপনাকে ছেড়ে দিলে তো কেঁদে বাঁচবেন । কিন্তু ওরা যে আপনাকে ছাড়বেই না। আপনি এখন যেখানে যাবেন ওরাও আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

কেন, কেন?

কারণ আপনি এখন বিখ্যাত হয়েছেন।

বটে, বটে, তাই নাকি? তাহলে আমি অজ্ঞাতবাস করব।

ওরা আবার আপনাকে খুঁজে বার করবে।

বিনয়বাবু অত্যন্ত দুঃখিতভাবে বললেন, তাহলে আমাকে মঙ্গল গ্রহে যাত্রা করতে হবে।

বিমল, এই এক দিনেই কথা কয়ে কয়ে আমার মুখে ব্যথা ধরে গেছে, আজ সারাদিন আমি একটুও জিরুতে পারিনি।

শূন্যে

আজ সকাল থেকে ডাকবাংলোয় লোকের পর লোক আসছে। —সারা দিনের মধ্যে বিনয়বাবু একটু হাঁপ ছাড়বারও ছুটি পেলেন না ।

বৈকালে তিনি মরিয়া হয়ে বাংলো ছেড়ে পলায়ন করলেন—সঙ্গীদের কোন খবর না দিয়েই।

বিমল, কুমার, কমল ও রামহরি চারিদিকে খুঁজতে বেরুল, কিন্তু বিনয়বাবুকে কোথাও পাওয়া গেল না।

বিমল মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, তাইতো, সত্যি-সত্যিই তিনি দেশত্যাগী হয়ে গেলেন নাকি?

রামহরি বললে, হয়তো এতক্ষণে তিনি নিজেই বাসায় ফিরেছেন।

দেখা যাক, বলে বিমলও আবার বাংলোর পথ ধরল। তখন সন্ধে হয়েছে। সকলে যখন একটা বাঁশবনের পাশ দিয়ে আসছে—হঠাৎ তার ভিতরে একটা খড়মড় শব্দ শোনা গেল। বিলাসপুরে আজকাল একটা চিতাবাঘের উপদ্রব হয়েছে—বিমল তাড়াতাড়ি তাই তার বন্দুকটা বাগিয়ে ধরলে। সেদিনের সেই ব্যাপারের পর থেকে বন্দুক না নিয়ে সে আর পথে বেরোয় না।

বন্দুক তোলবামাত্র বাঁশবনের ভিতর থেকে শোনা গেল—বিমল ভায়া, সাবধান ! যেন আমাকে শিকার করে ফেল না।

কমল বলে উঠল, এ যে বিনয়বাবুর গলা।

বিনয়বাবু হাসতে হাসতে বঁশঝাড়ের এক পাশ থেকে বেরিয়ে এলেন।

বিমল আশ্চর্য স্বরে বললে, ওকি বিনয়বাবু, ওখানে আপনি কী করছিলেন?

বিনয়বাবু বললেন, দিব্যি নিরিবিলি হে, ঘাসের ওপরে পরম আরামে শুয়ে ছিলাম।

যদি সাপে কামড়াত?

সাপে শুধু কামড়ায়, কিন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। উঃ, ডাকবাংলোয় আরো কিছুক্ষণ থাকলে আমি পাগল হয়ে যেতুম!-- বিমল, বাংলো থেকে আপদগুলো এতক্ষণে বিদায় হয়ে গেছে কি?

বিমল বললে, এতক্ষণে বোধহয় গেছে।

বিনয়বাবু বললেন, দেখ বিমল, বাংলো থেকে বেরিয়ে এসে আর একটা উপকারও হয়েছে। এখানে শুয়ে শুয়ে আমি একটা দৃশ্য দেখলুম।

কী দৃশ্য?

সামনেই মাঠের ওপরে গাঁয়ের ছেলের ফুটবল খেলছিল। আমি এইখানে শুয়ে অন্যমনস্ক ভাবে তাই দেখছিলুম। এমন সময় আকাশে হঠাৎ সেই ভয়ানক শব্দটা শুনলুম—যেন হাজার হাজার শ্লেটের ওপরে কারা হাজার হাজার পেন্সিল চালিয়ে যাচ্ছে।

বিমল, কুমার ও কমল একসঙ্গে বলে উঠল, 'অ্যাঃ, দিনের ৰেলায়?

বিনয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ। এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দাদের সাহস দিনে দিনে বেড়ে উঠছে। শীঘ্রই তারা আমাদের ওপরে অত্যাচার শুরু করবে।

বিমল বললে, তারপর?

শব্দটা শুনেই আমি তো ধড়মড় করে উঠে বসলুম। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, সেই প্রকাণ্ড কালো ছায়াটা ঘুরতে ঘুরতে নিচে নেমে আসছে। মাঠের দিকে চেয়ে দেখলুম, ছেলেরা তখনো ফুটবল খেলা নিয়ে মত্ত—কিছুই তার টের পায়নি। হঠাৎ ফুটবলটা লাথি খেয়ে খুব উঁচুতে উঠল.কিন্তু সেটা উপর দিকেই সমানে উঠে মিলিয়ে গেল, নিচে আর নেমে এল না। ছেলেরা তো অবাক।

তারপর আকাশপানে চেয়ে সেই কালো ছায়াটা দেখেই তারা ভয় পেয়ে যে যার বাড়ীর দিকে দৌড় মারলে।

আর সেই কালে ছায়াটা?

সেটা আর নিচের দিকে নামল না, আকাশের গায়ে এক জায়গাতেই তুলতে লাগল। সন্ধে পর্যন্ত যতক্ষণ চোখ চলে, আমি তাকে মাঠের উপরে ঐখানে দেখেছি'—বলে বিনয়বাবু আকাশের একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

সকলে সেইদিকে চেয়ে দেখলে, কিন্তু কিছুই দেখা গেল না— আকাশ তখন অন্ধকার।

বিনয়বাবু বললেন, আজ আমি অনেকক্ষণ ধরে ছায়াটা—অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহের উড়োজাহাজখানা দেখবার সুবিধা পেয়েছি। যদিও সেটা অনেক উঁচুতে ছিল, তবু আমি আন্দাজেই বলতে পারি যে, উড়োজাহাজখানার আকার খুব প্রকাণ্ড—অন্তত মাইলখানেকের কম লম্ব তো হবেই না।

রামহরি বললে, বাবু, আমার বুক কেমন ছমছম করছে। আর এখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে, বাসায় ফিরে চলুন, সেখানে গিয়ে কথাবার্তা কইবেন।

এমন সময়ে দেখা গেল, গায়ের ভিতর থেকে অনেকগুলো লণ্ঠন নিয়ে একদল লোক মাঠের উপরে এসে দাঁড়াল ।

কুমার বললে, মিলিটারি পুলিশ, সকলের হাতেই বন্দুক রয়েছে।

বিনয়বাবু বললেন, ছেলেদের মুখে খবর পেয়েই বোধহয় ওরা এইদিকে এসেছে। কিন্তু ওরা আর করবে কী, উড়োজাহাজ পর্যন্ত বন্দুকের গুলি তো পৌছবে না।

ধীরে ধীরে আকাশের গায়ে তৃতীয়ার চাঁদ হাসিমুখে জেগে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দ শোনা গেল—হাজার হাজার শ্লেটের উপর হাজার হাজার পেন্সিলের শব্দ ।

বিনয়বাবু বললেন, শব্দটা যে আগেকার চেয়েও আরো কাছে বলে মনে হচ্ছে?

সকলে কান পেতে শুনতে লাগল—শব্দ আরো কাছে নেমে এল, আরো—আরো কাছে।

রামহরি ভীত স্বরে বললে, চলুন, চলুন—এইবেল পালাই চলুন।

শব্দ আরো কাছে । আচম্বিতে পাশের বাঁশ-ঝড় ও গাছপালার মধ্যে ঝড় জেগে উঠল—কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝড়।

বিনয়বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, হুঁসিয়ার-হুঁসিয়ার।

সঙ্গে সঙ্গে রামহরি, কুমার ও কমল আর্তনাদ করে উঠল। বিনয়বাবু ও বিমল স্তম্ভিতের মতন দেখলেন, তারা তিনজনেই ছটফট করতে করতে তারের মতন বেগে শূন্যে উঠে যাচ্ছে।.মাঠের দিক থেকে সেপাইদের অনেকগুলো বন্দুকের আওয়াজ এল।

পর-মুহূর্তে বিনয়বাবু ও বিমলের দেহও উপরের সেই সর্বগ্রাসী কালো ছায়ার দিকে প্রচণ্ড বেগে উড়ে গেল—চুম্বকের টানে লোহার মত।

সেপাইরা আবার একসঙ্গে বন্দুক ছুড়লে।

শূন্যে

কোথা দিয়ে কী যে হল, কেউ তা বুঝতে পারলে না।

বিনয়বাবু প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করেও রক্ষা পেলেন না, শূন্যের সেই অদৃশ্য শক্তির কাছে তার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল, কি একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণি হাওয়ার মুখে তুচ্ছ ছেড়াপাতার মত তিনি তীরের চেয়েও বেগে আকাশের দিকে উঠে গেলেন—কানের কাছে বাজতে লাগল কেবল একটা ঝড়ের শনশনানি এবং দুম-দুম করে অনেকগুলো বন্দুকের শব্দ।.তার পরেই বিষম একটা ধাক্কা-সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত যন্ত্রণায় তিনি কেমন যেন আচ্ছল্লের মতন হয়ে গেলেন। অনেক কষ্টে আপনাকে সামলে নিয়ে বিনয়বাবু প্রথমেই দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে যেন একটা নীল রঙের স্রোত। হাত দিয়ে অমুভব করে বুঝলেন, তিনি আর শূন্যে নেই, একটা শীতল পদার্থের উপরে শয়ন করে আছেন ।

আস্তে আস্তে উঠে বসে দেখলেন, যার উপরে তিনি শুয়ে ছিলেন সেটা কাচের মত স্বচ্ছ এবং তার রঙ আকাশের মতই নীল। কেবল তাই নয়—তার ভিতর দিয়ে অনেক নিচে পৃথিবীর গাছপালা ও আলো দেখা যাচ্ছে ।

অত্যন্ত কৌতুহলী হয়ে বিনয়বাবু ভালো করে গৃহতলট পরীক্ষা করতে লাগলেন। তিনি বুঝলেন, তা নীল রঙের কাচের মতন এমন কোন স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে তৈরি, পৃথিবীতে যা পাওয়া যায় না। বিনয়ব।ধুর এটা বুঝতেও দেরি হল না যে, মঙ্গল গ্রহের উড়োজাহাজের সমস্তটাই ঠিক এই একই পদার্থের দ্বারা প্রস্তুত। মেঝের উপরে বারকয়েক সজোরে করাঘাত করে তিনি আরো বুঝলেন, যে জিনিসে এটা তৈরি তা স্বচ্ছ ও পাতলা হলেও, রীতিমত কঠিন ও হাস্কা ।

তারপরেই বিনয়বাবুর মনে পড়ল তাঁর সঙ্গীদের কথা। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শুনতে পেলেন, বিমল অত্যন্ত বিহবল স্বরে ডাকছে, ‘বিনয়বাবু, বিনয়বাবু!

বিনয়বাবু চেয়ে দেখলেন খানিক তফাতেই বিমল ছুই হাতে ভর দিয়ে বসে আছে।...আরো খানিক তফাতে রামহরি উপুড় হয়ে পড়ে আছে, তার কাছেই কমল ফ্যাল-ফ্যাল করে চারদিকে তাকিয়ে দেখছে এবং আর একটু দূরে দুই হাঁটুর ভিতরে মুখ ঢেকে বসে রয়েছে কুমার ।

দলের সবাইকে একত্রে অক্ষত দেহে দেখতে পেয়ে, এত বিপদের মধ্যেও বিনয়বাবুর মনটা খুসি হয়ে উঠল।

বিমল আবার ডাকলে, বিনয়বাবু।

বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে বললেন, কী ভাই বিমল, কি হয়েছে?

এসব আমরা কোথায় এলুম?

বুঝতে পারছ না? মঙ্গল গ্রহের উড়োজাহাজে।

তাহলে আপনার সন্দেহই সত্য?—বলেই বিমল বিস্মিত চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

বিনয়বাবু বললেন, বিমল, এ উড়োজাহাজ কী আশ্চর্য জিনিস দিয়ে তৈরি, সেটা কিন্তু ধরতে পারছি না। এ জিনিসটা নীল-রঙ কাচের মত, অথচ কাচ নয়। উপরে চেয়ে দেখ, দেয়ালের ভিতর দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছে।

বিমল বললে, কিন্তু এ উড়োজাহাজ চালাচ্ছে কারা?

এখনো তাদের কারুর দেখাই পাইনি।. বিমল, বিমল, মনে আছে তো, আমি বলেছিলুম যে কোন vacuum যন্ত্র দিয়ে এই উড়োজাহাজ পৃথিবী থেকে নমুনা সংগ্রহ করছে? ঐ দেখ।

বিমল হেঁট হয়ে স্বচ্ছ গৃহতলের ভিতর দিয়ে দেখলে, তাদের কাছ থেকে অনেক তফাতে, একটা বিরাট ঘণ্টার মতন জিনিস নিচের দিকে নেমে গেছে—তার দীর্ঘতা প্রায় তিনশো ফুট ও বেড় প্রায় একশো ফুটের কম হবে না ।

বিমল আশ্চর্য স্বরে বললে, অত বড় একটা যন্ত্র যখন এই উড়েজাহাজের গায়ে লাগানো আছে, তখন এর আকার না জানি কী প্রকাণ্ড।

বিনয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ, এত বড় উড়োজাহাজের কল্পনা বোধহয় পৃথিবীতে এখনো কেউ করতে পারেনি। যে উড়োজাহাজে আমরা আছি, এটা নিশ্চয়ই একটা ছোটখাট শহরের মতন বড়।

কিন্তু আমি কি ভাবছি জানে বিমল? আমরা ঐ Vacuum যন্ত্র দিয়ে এখানে কী করে এলুম? চেয়ে দেখ, আমরা এখন যেখানে আছি, এর চারদিক দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। কে বা কারা আমাদের এখানে নিয়ে এল? আর কোন পথ যখন নেই, তখন আমরা এখানে এলুমই বা কেমন করে?

বিমল বললে, কেমন একটা ধাক্কা লাগতে আমি আচ্ছল্লের মতন হয়ে পড়েছিলুম, কোথা দিয়ে কী যে ঘটল কিছুই বুঝতে পারিনি।

আমারও ঠিক সেই অবস্থাই ঘটেছিল। কিন্তু ঐ দেওয়ালগুলোর পিছনে কী আছে? জানবার জন্যে আমার কেমন কৌতুহল হচ্ছে।

কিন্তু কৌতুহল নিবৃত্তির কোন উপায়ও নেই। কারণ বিনয়বাবুরা যে কামরায় আছেন, তার ছাদ, মেঝে ও এক পাশের দেওয়াল ছাড়া আর তিনদিকের দেওয়াল কালো রঙের পর্দা দিয়ে ঘেরা—স্বচ্ছ দেওয়ালের ও-পাশে পর্দার ভাঁজ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

বিমল বললে, এ কামরায় যে আলো জ্বলছে, তা লক্ষ্য করে দেখেছেন?

হ্যাঁ ও আলোর ব্যবস্থা হয়েছে নিশ্চই রেডিয়ামের সাহায্যে।

রেডিয়ামের সাহায্যে?

হ্যাঁ। রাত্রের অন্ধকারে রেডিয়ামের ঘড়ি দেখেছ তো? এখানে সেই উপায়ে, অর্থাৎ ঘড়ির বদলে ঘর আলোকিত করা হয়েছে । বিমল, মঙ্গল গ্রহের উড়োজাহাজে আসতে বাধ্য হয়ে তুমি ভয় পাওনি তো?

না, বিনয়বাবু, ভয় আমি মোটেই পাইনি, কিন্তু আমি চিন্তিত হয়েছি।

চিন্তিত হয়েছ? কেন?

আমাদের ভবিষ্যৎ ভেবে।

ভবিষ্যতের কথা ভুলে যাও বিমল, ভবিষ্যতের কথা ভুলে যাও; এখন খালি বর্তমানের কথা ভাব। আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমি কিন্তু খুব খুসি হয়েছি। আমাদের চোখের সামনে এখন এক নতুন জ্ঞানের রাজ্য খোলা রয়েছে—এক নতুন জগৎ, নতুন দৃশ্যের পর নতুন দৃশ্য। এমন সৌভাগ্য যে আমার হবে, আমি তা কল্পনাও করতে পারিনি।

পিছন থেকে এতক্ষণ পরে কুমার বললে, আপনার এ আনন্দ বেশীক্ষণ থাকবে না বিনয়বাবু! ভেবে দেখেছেন কি, আমরা আর কখনো পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারব না?

বিনয়বাবু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কিন্তু সে কথা ভেবে মন খারাপ করে কোন লাভ নেই তো ভাই। পুরানো পৃথিবীতে না যেতে পারি, আমরা না হয় এক নতুন পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে নতুনভাবে জীবনযাপন করব। মন্দ কী?

কমল বললে, কিন্তু এটাও ভুলবেন না বিনয়বাবু, যারা আমাদের ধরে এনেছে, তার মানুষের শব-ব্যবচ্ছেদ করে।

রামহরি বললে, আমরা যে ভূত-প্রেতের হাতে পড়িনি, তাই বা কে বলতে পারে?

বিমল গম্ভীর স্বরে বললে, প্রাণ আমি সহজে দেব না। বাংলো থেকে আমি বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছিলুম, সে বন্দুকও আমার সঙ্গে এখানে এসেছে।

কুমার বললে, বন্দুক আমারও আছে। প্রথমে ঝোড়ো হাওয়ার টানে বন্দুকটা আমার হাত থেকে খসে পড়েছিল, কিন্তু এখানে এসে দেখছি আমার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটাও উপরে এসে হাজির হয়েছে।

বিনয়বাবু বললেন, বিমল, কুমার, তোমরা ছেলেমানুষি করে না। যারা আমাদের ধরে এনেছে, তাদের বুদ্ধি আর শক্তির কিছু কিছু পরিচয় তো এর

মধ্যেই পেয়েছ। দুটো বন্দুক নিয়ে এদের বিরুদ্ধে কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে? তার চেয়ে—

বিনয়বাবু কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ কিসের একটা শব্দ হল—সঙ্গে সঙ্গে একদিকের দেওয়াল ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল।

বিনয়বাবু বললেন, সাবধান। দেওয়ালটা এরা নিশ্চয় কোন কল টিপে সরিয়ে ফেলেছে। এতক্ষণে বুঝলুম, এ কামরায় দরজা নেই কেন।

দেওয়ালটা যখন একেবারে সরে গেল, তখন সামনেই এক অদ্ভূত দৃশ্য দেখে সকলেই সবিস্ময়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠল।

রামহরি তাড়াতাড়ি তুই হাতে চোখ চেপে ফেলে বললে, এরা যমদূত, এরা যমদূত। আমাদের নরকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে।

এমন কি বিনয়বাবু পর্যন্ত কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন–তাঁর মনে হল, তিনি যেন এক ভয়ানক উদ্ভট স্বপ্ন দেখছেন।

মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা

বিনয়বাবু দেখলেন, দেওয়ালটা সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভূত জীব তাদের সামনে এসে আবির্ভূত হল।

তার মাথাটা প্রকাণ্ড, এবং বিশেষ করে বড় কপাল থেকে খুলির দিকটা মুখখান অবিকল ত্রিকোণের মতন দেখতে। ছোখ ছটো ঠিক গোল গোল ভাটার মতন—তাদের ভিতরে রক্তজবার মত রাঙা দুটো তারা। কান দুটো শিঙের মতন। নাকের কাছে গোল একটা ছ্যাদা ছাড়া আর কিছুই নেই। ঠোঁট ধনুকের মতন বাঁকা।

তার দেহ ও হাত-পা মানুষের মতন বটে, কিন্তু আকারে সমস্ত দেহটাই মাথা ও মুখের চেয়ে বড় হবে না। বিশেষ, তার দেহ আর হাত-পা অসম্ভব রকম রোগা ও অমানুষিক। তার উচ্চতা হবে বড়-জোর তিন ফুট—এর মধ্যে মাথা ও মুখের মাপই বোধহয় দেড় ফুট।

এই অপরূপ মূর্তির রঙ ঠিক শ্লেটের মতন, কিন্তু তার মাথায় বা মুখে একটিমাত্র চুলের চিহ্নও নেই।

মূর্তির পরনে লাল রঙের খাটো কোট,—কিন্তু কোটের হাতা কনুইয়ের কাছ থেকে কাটা। কোটের তলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত শাদা রঙের ইজের বা হাফপ্যান্ট। পায়ে খড়মের মত কাষ্ঠপাদুকা। খড়মের সঙ্গে তার তফাত শুধু এই যে, আঙুলের ও গোড়ালির দিকে দুটো করে চামড়ার ফিতে দিয়ে জুতো-জোড়া পায়ে লাগানো আছে। মূর্তির কোমরে একখানা তরবারি ঝুলছে, লম্বায় সেখানা পৃথিবীতে ব্যবহৃত ছোরার চেয়ে বড় নয়—চওড়ায় আরো ছোট পেন্সিল-কাটা ছুরির মত।

মূর্তি তার ভয়ানক। চোখ মেলে বন্দীদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল; তারপর বাজখাই গলায় কি একটা শব্দ উচ্চারণ করলে। তখনি আর একদল ঠিক সেইরকম মূর্তি কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। এই নতুন দলের সকলের হাতেই একগাছা করে বর্শা।

বিমল বললে, বিনয়বাবু, এরাই কি মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা?

বিনয়বাবু বললেন, তাই তো দেখছি!

বিমল বললে, এই তুচ্ছ জীবগুলো এসেছে পৃথিবীর উপরে অত্যাচার করতে।

বিনয়বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, বিমল, চেহারা এদের যেমনই হোক, কিন্তু এদের তুচ্ছ বলে ভেবো না। কারণ যারা এমন আশ্চর্য উড়োজাহাজ তৈরি করেছে তাদের তুচ্ছ বলে ভাবলে ভুল করা হবে। ঐ প্রকাণ্ড মাথাই ওদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে। পণ্ডিতদের মতে, হাজার হাজার বৎসর পরে পৃথিবীর মানুষদেরও হাত-পা আর দেহ ছোট হয়ে গিয়ে মাথা বড় হয়ে উঠবে। যারা যে অঙ্গ যত বেশী ব্যবহার করে তাদের সেই অঙ্গ তত বেশী প্রধান হয়ে ওঠে। দিনে দিনে মানুষের মস্তিষ্কের চর্চা বাড়ছে, দেহের চর্চা কমছে; কাজেই তাদের মাথা স্বাভাবিক নিয়মে বড় হয়ে উঠবেই।

কুমার বললে, ওদের বর্শার ফলাগুলো কী দিয়ে তৈরী? ও যে ঠিক সোনার মত দেখাচ্ছে।

বিনয়বাবু বললেন, আমারও সন্দেহ হচ্ছে। মঙ্গল গ্রহে হয় লোহা পাওয়া যায় না, নয় সেখানে সোনা এত সস্তা যে, তার কোন দাম নেই।

বিমল বললে, প্রথম জীবটা বোধহয় ওদের দলপতি। ঐ দেখুন, এইবারে ওরা আমাদের কাছে আসছে।

মূর্তিগুলো এগিয়ে এসে বন্দীদের ঘিরে দাঁড়াল। তারপর দলের ভিতর থেকে পাঁচজন লোক বেরিয়ে এল, তাদের প্রত্যেকের হাতে একগাছা করে শিকল।

প্রথমেই একজন এসে বিমলের হাত ধরে টানলে, তারপর তার হাতে শিকল পরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। চকিতে হাত সরিয়ে বিমল ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, কী! এত বড় আস্পর্ধা চোখের পলক না ফেলতে বিমলের চারপাশে পঁচিশ-ত্রিশটা বর্শায় ফলা চমকে উঠল।

বিনয়বাবু বললেন, দোহাই তোমার, ওদের বাধা দিও না, আমাদের প্রাণ এখন ওদেরই হাতে।

বিমল বললে, তা বলে আমি আমার হাত বাঁধতে দিচ্ছি না। এই হেঁড়ে-মাথা তালপাতার সেপাইগুলোকে আমরা এখনি টিপে মেরে ফেলতে পারি।

বিনয়বাবু বললেন, এ দলের পিছনে আরো কত দল আছে কে জানে? ছেলেমানুষি করলে আমরা সকলে মারা পড়ব।

বিমল অত্যন্ত অনিচ্ছুক্ষভাবে আবার হাত বাড়ায় দিলে।. একে একে সকলেরই হাত তারা শিকল দিয়ে বেঁধে ফেললে।

রামহরি কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে, এইবারে আমাদের নিয়ে গিয়ে এরা বলি দেবে।

কুমার বললে, একটু পরে যখন মরতেই হবে, তখন যেচে ধরা দেওয়াটা ঠিক হল কি?

কমল কিছু বললে না, নিজের বাড়ীর কথা আর বাপ-মায়ের মুখ মনে করে তার তখন কান্না আসছিল।

বিনয়বাবু এক মনে হাতের শিকল পরখ করছিলেন। হঠাৎ তিনি মুখ তুলে বললেন, বিমল, হাতের শিকল ভালো করে দেখেছ?

কেন?

এ শিকল খাটি সোনার।

রামহরি বিস্ফারিত চক্ষে হাতের শৃঙ্খলের দিকে তাকিয়ে বললে, তাহলে এ শিকল আর আমি ফিরিয়ে দেব না। সোনার মায়া এমনি আশ্চর্য যে, বন্দী হয়েও রামহরির মন যেন অনেকটা আশ্বস্ত হল।

এদিকে সেই সশস্ত্র জীবগুলো একদিকে সার গেঁথে দাঁড়াল। তাদের দলপতি বন্দীদের সামনে এসে, হাতের ইশারায় অগ্রসর হতে বললে...

বিনয়বাবু বললেন, এস, সকলে মিলে এগুনো যাক। এই বারে এখানে আরো কত আশ্চর্য ব্যাপার আছে, সমস্তই দেখতে পাওয়া যাবে।

চৌবাচ্চায় পুষ্করিণী

সব আগে বিনয়বাবু, তারপর যথাক্রমে বিমল, কুমার, কমল আর রামহরি এবং তারপর মঙ্গল গ্রহের হেঁড়ে-মাথা বামন সেপাইরা পরে পরে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল ।

বিনয়বাবু দেখলেন, তারা একটি খুব লম্বা পথের উপরে এসে দাঁড়িয়েছেন—সে পথের উপরে দীর্ঘতা অন্তত হাজার ফুটের কম হবে না। বলা বাহুল্য, পথটাও সেই নীল রঙা কাচের মত জিনিস দিয়ে তৈরী। পথে তু-পাশে সারি-বাঁধা ঘর এবং সব ঘরের দেওয়ালই কালে পর্দা দিয়ে ঢাকা।

খানিক দূরে যেতে-না-যেতেই সেপাইদের দলপতি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে, ঝকঝকে সোনার তরোয়াল খুলে বন্দীদের দাঁড়াতে ইঙ্গিত করলে। তারপর এক পাশের পর্দা সরিয়ে একটা অব্যক্ত তীব্র শব্দ করে সামনের দরজায় তিনবার ধাক্কা মারলে। অমনি দরজাটা ভিতর থেকে খুলে গেল এবং আর-একটি বামন মূর্তি বাইরে এসে দাঁড়াল।

এ মূর্তির আকারও আগেকার মূর্তিগুলিরই মত, কিন্তু তার পোশাক অন্যরকম। তার গলা থেকে পা পর্যন্ত একটা সবুজ রঙের কোর্তা, মাথায় একটা লাল রঙের টুপি—দেখতে অনেকটা গাধার টুপির মত। কোর্তর উপরে একছড়া মালা—তাতে অনেকগুলো পাথর জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

বিনয়বাবু চুপি চুপি বললেন, বিমল, পাথরগুলো বোধহয় হীরে।

বিমল বললে, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু এর কাছে আমাদের নিয়ে এল কেন?

বোধহয় এই জীবটাই এখানকার কর্তা। দেখছ না, সেপাইদের দলপতি ওকে হেঁট হয়ে অভিবাদন করলে । ওর পোশাকও সেপাইদের চেয়ে ঢের বেশী জমকালো।

নতুন মূর্তিটা খানিকক্ষণ বন্দীদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখলে; তারপর সেপাইদের দলপতির দিকে ফিরে মঙ্গল গ্রহের ভাষায় কি বলতে লাগল। বিনয়বাবু খুব মন দিয়ে শুনেও সে ভাষার কিছু বুঝতে পারলেন না, কিন্তু কতকগুলো বিষয় তিনি লক্ষ্য করলেন। প্রথমত, তাদের ভাষায় বর্ণমালা খুব কম, কারণ কথা কইতে কইতে তারা একই বর্ণ ক্রমাগত উচ্চারণ করে। দ্বিতীয়ত, চীনেদের মত তাদের ভাষায় অনুঃস্বরের বিশেষ বাড়াবাড়ি।

কথাবার্তা শেষ করে সেপাইদের দলপতি বন্দীদের কাছে আবার ফিরে এল। তারপর হাত নেড়ে ইঙ্গিত করে আবার সকলকে অগ্রসর হতে বললে।

বন্দীর আবার অগ্রসর হল, কিন্তু অল্পদুর অগ্রসর হয়েই সকলে বিস্মিতভাবে শুনতে পেলে, কেমন একটা কিচির-মিচির শব্দ হচ্ছে।

বিনয়বাবু বললেন, এ যে একদল বানরের চীৎকার।

কমল বললে, মঙ্গল গ্রহেও বানর আছে?

বিনয়বাবু বললেন, না, আমার বোধহয় এ সেই বানরের দল—বিলাসপুরের বটগাছের উপরে যারা বাসা বেঁধে থাকত।

আরো কয়েক পা এগিয়ে আবার এক অভাবিত ব্যাপার। পথের এক পাশে মস্ত বড় একটা খোলা জায়গা, আর সেইখানে বিশাল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে খাড়া হয়ে আছে—প্রকাণ্ড একটা বটগাছ। এত বড় গাছ চোখে দেখা যায় না!

বিনয়বাবু বললেন, বিলাসপুরের বিখ্যাত বটগাছ। মস্ত একটা মাটির ঢিবি তৈরি করে তার উপরে বটগাছটি পোতা রয়েছে এবং তার নিচেকার ডালে ডালে সোনার শিকল দিয়ে বাধা অনেকগুলো বানর। নিয়বাবু প্রভৃতিকে দেখে

বানরগুলো আরো জোরে কিচির-মিচির করে চেঁচিয়ে উঠল—অমানুষের আড্ডায় পরিচিত মানুষের দেখা পেয়ে এ যেন বানরদের প্রাণের আনন্দ প্রকাশ!

বটগাছের পাশেই আর এক আশ্চর্য দৃশ্য! সেই নীল-রঙা কাচের মত স্বচ্ছ জিনিস দিয়ে তৈরী পুকুরের মত বড় একটা চৌবাচ্চা এবং তার মধ্যে টল-টল করছে এক চৌবাচ্চ জল। খালি তাই নয়, জলে যে দলে দলে মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে, স্বচ্ছ চৌবাচ্চার পাশ থেকে তাও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ।

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, বিনয়বাবু, এ জল বিলাসপুরের সেই পুকুর থেকে চুরি করে আনা হয়নি তো?

বিনয়বাবু বললেন, নিশ্চয় তাই হয়েছে।

কমল বললে, কিন্তু এসব নিয়ে এরা করছে কী?

বিনয়বাবু বললেন, সে কথা তো আগেই বলেছি। এরা পৃথিবী থেকে নমুনা সংগ্রহ করছে বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্যে।

বিমল বললে, ঐ নগণ্য বামন-জানোয়ারগুলো যে এমন সব অসাধ্য সাধন করতে পারে, তা তো আমার বিশ্বাস করতেও প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

বিনয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, বিমল, পৃথিবীর মানুষের মত চেহারা না হলেই কোন জীবকে যে মানুষের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর বলে মানতে হবে, তার কোন মানে নেই। অথচ তুমি বারবার সেই ভ্রম করছ। আকাশে পৃথিবীর চেয়ে ঢের বড় শত শত গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে—হয়ত তার অনেকের মধ্যেই এমন সব সভ্য জীবের অস্তিত্ব আছে যারা মোটেই মানুষের মত দেখতে নয়। তাদের চেহারা দেখলে আমরা যেমন অবাক হব, আমাদের চেহারা দেখলে তারাও তেমনি অবাক হতে পারে। তারাও আমাদের দেখে হয়ত নিচুদরের জানোয়ার বলেই ধরে নেবে। ভবিষ্যতে এমন ভ্রম আর করো না। কারণ মঙ্গল গ্রহের জীবরা যে নগণ্য নয়, তার অসংখ্য প্রমাণ তো চোখের উপরে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছ। এরা দেহের জোরে

আমাদের সমকক্ষ না হলেও বুদ্ধির জোরে আমাদের চেয়েও যে অনেক এগিয়ে গেছে, এটা আমি মানতে বাধ্য।

কমল বললে, কিন্তু একটা কথা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের মত এর আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানে না।

বিনয়বাবু বললেন, হ্যাঁ, আমারও সেই বিশ্বাস। কিন্তু এ থেকে প্রমাণ হয় না যে এরা আমাদের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর জীব। দরকার হলেই কোন জিনিসের আবিষ্কার হয়, এটা হচ্ছে সভ্যতার নিয়ম। এদের বন্দুক-কামানের দরকার হয়নি, তাই এরা তার জন্যে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু এখানে আগে থাকতে এক বিষয়ে তোমাদের সাবধান করে রাখছি। বিমল, কুমার, তোমাদের বন্দুক আছে বলে তোমরা যেন তার অপব্যবহার করো না।

রামহরি বললে, আমাদের তো হাত বাধা, ইচ্ছে করলেও বন্দুক ছুড়তে পারব না। সুতরাং আমাদের কাছে বন্দুক থাকা না-থাকা দুইই সমান।

বিমল হেসে বসলে, এই পাতলা সোনার শিকল আমি এক টানে এখনি ছিড়ে ফেলতে পারি,—আমি কি মঙ্গল গ্রহের বামন যে এই শিকলে বাধা থাকব?

বিনয়বাবু বললেন, হ্যাঁ, যদিও আমার বয়েস হয়েছে, তবু এই সোনার শিকল ছেড়বার শক্তি এখনো আছে। তবে, আমাদের এ শক্তিও আপাতত ব্যবহার না করাই ভালো।

সামনে মরণ

সেপাইদের দলপতির ইঙ্গিতে আবার সকলকে দাঁড়াতে হল। সেখানেও পথের দুই ধারেই কালো-পর্দা-ঢাকা দেওয়াল।

হঠাৎ সেই দেওয়ালের ওপাশ থেকে একটা শব্দ শুনে সকলেই চমকে উঠল। কে যেন মানুষের গলায় করুণ স্বরে ক্রন্দন করছে।

দলপতি এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালের উপরে একটা সোনার হাতল ধরে ঘুরিয়ে দিলে, সামনের লম্বা দেওয়ালটা অমনি একপাশে সরে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কান্নার আওয়াজ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু কালে পর্দাটা তখনো সকলের দৃষ্টি রোধ করে ছিল বলে কে কাঁদছে তা দেখা গেল না।

ইতিমধ্যে বামন-সেপাইরা একসঙ্গে একটা চীৎকার করে উঠল—চীৎকারটা শোনাল অনেকটা এই রকম—ঘং ঘং ঘং।—-অমনি পথের আর-এক পাশের দেওয়াল ও সরে গেল এবং পর্দা ঠেলে দলে দলে বেরিয়ে এল পঙ্গপালের মত শত শত বামন-সেপাই। তাদের সকলেরই হাতে প্রায় সাড়ে তিন ফুট উঁচু একগাছা করে সোনারফলা-ওয়ালা বর্শা।

বিনয়বাবু বললেন, দেখছ তো বিমল, এখানে জোর খাটিয়ে লাভ নেই। আমরা এদের বিশ-পঁচিশ জনকে বধ করলেও শেষ কালে আমাদেরই মরতে হবে।

নতুন সেপাইয়ের দল আসার সঙ্গে সঙ্গেই দলপতি ওধারকার দেওয়ালের পর্দায় ঝোলানো একটা দড়ি ধরে টানলে, সঙ্গে সঙ্গে পর্দাটি সরে গেল এবং সকলের চোখের সামনে ফুটে উঠল এক বিচিত্র দৃশ্য!

খুব লম্ব একখানা ঘর এবং কাচের মত মেঝের উপরে শুয়ে বসে ও দাঁড়িয়ে আছে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন মানুষ। তাদের সকলেরই মুখ বিমর্ষ, কেউ

চাপা গলায়, কেউ বা উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করছে। দেওয়ালের গায়ে আড়াআড়িভাবে অনেকগুলো সোনার রিঙ বসানো এবং এক-একটা রিঙ থেকে এক-এক গাছ লম্বা সোনার শিকল ঝুলছে,-প্রত্যেক বন্দীর হাত খোলা থাকলেও ডান পা সেই শিকলে বাধা।

বিমল ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, দেখুন, বিনয়বাবু, এই হতভাগা বামনরা পৃথিবী থেকে কত মানুষ ধরে এনেছে।

বিনয়বাবু দুঃখিতভাবে শুধু বললেন, হুঁ।

রামহরি হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললে, আমাদেরও এখুনি ঐ দশা হবে, হা অদৃষ্ট।

বিমলের কপালের শির ফুলে উঠল, রুদ্ধ আক্রোশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কাঁপতে লাগল।

এমন সময়ে সেপাইদের দলপতি কি একটা হুকুম দিলে—সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সেপাই বিমল ও কুমারের কাছে এসে তাদের বন্দুক দুটো কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে।

বিমল চেঁচিয়ে বললে, খবরদার কুমার, বন্দুক ছেড়ো না! বন্দুক গেলে আমাদের আর আত্মরক্ষার কোন উপায়ই থাকবে না।

বিনয়বাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, ‘বিমল, বিমল, ওদের বাধা দিয়ে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনো না।

বিমল দৃঢ় স্বরে বললে, আসুক বিপদ! এখানে শেয়ালকুকুরের মত সারাজীবন বাধা থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভালো!

বামন-সেপাইরা নাছোড়বান্দা দেখে বিমল তাদের উপরে বারকয়েক পদাঘাত করলে,—তিনজন বামন বিকট আর্তনাদ করে মেঝের উপরে ঠিকরে গিয়ে পড়ল—তারপর আর তার চ্যাঁচালও না, একটু নড়লও না ।

সেপাইদের দলপতি তাঁর গোল গোল ভাটার মত চোখ আরো বিস্ফরিত করে বললে, ‘ভং ভং—ভংকা।

চোখের পলক না ফেলতে সেই শত শত বামন-সেপাই তাদের হাতের বর্শাগুলো মাথার উপরে তুলে ধরলে।

বিমল পিছু হটে গিয়ে এক মুহুর্তের মধ্যে হাতের শিকল ছিঁড়ে ফেললে। তারপর বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে বললে, বিদায় বিনয়বাবু,— আমি মরব, তবু আর বন্দী হব না। কিন্তু মরবার আগে এই মর্কটগুলোকে আমি এমন শিক্ষা দিয়ে যাব যে, এর জীবনে তা আর ভুলবে না।

রামহরিও একলাফে বিমলের সামনে এসে, তার দেহ ঢেকে দাঁড়িয়ে বললে, না, না। আগে আমাকে না মেরে এরা আমার খোকাবাবুকে মারতে পারবে না।

বর্শা উঁচিয়ে বামন-সেপাইরা বিমলের দিকে ছুটে এল।

বন্দুকের শক্তি

বর্শা উঁচিয়ে বামন-সেপাইরা বিমলের দিকে ছুটে এল। কিন্তু রামহরি হঠাৎ বিমলের দেহ ঢেকে দাঁড়াল দেখে তারা একটু খতমত খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সেপাইদের দলপতি আবার ক্রুদ্ধ স্বরে বললে,—'ভং ভং—ভংক। বামনরা আবার অগ্রসর হল। রামহরিকে এক ধাক্কা মেরে বিমল বললে, সরে যাও রামহরি, আমার সামনেটা আড়াল করে দাঁড়িও না।

বিমলের ঠিক সুমুখে এসে বামনরা তাকে বর্শার খোঁচা মারতে উদ্যত হল।

বিমল এক লাফে এক পাশে সরে গেল—সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের বন্দুকট ভীষণ গর্জন করে অগ্নিশিখা উদগার করলে।

পরমুহূর্তে দুজন বামন চীৎকার করে গৃহতলে লুটিয়ে পড়ল,— বন্দুকের গুলি নিশ্চয় প্রথম বামনের দেহ ভেদ করে দ্বিতীয় বামনকেও আঘাত করেছে।

বিমল আবার বন্দুক ছুড়লে—আবার আর একজন বামনের পতন হল।

ব্যাপার দেখে আর সব বামন-সেপাইরা তাড়াতাড়ি পিছু হটে গেল,— তাদের মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে তারা ভয়ানক স্তম্ভিত হয়ে গেছে। বন্দুক যে কী সাংঘাতিক জিনিস, তারা তো তা জানে না!

এদিকে বিনয়বাবুও ততক্ষণে নিজের হাতের শিকল ভেঙে ফেলে কুমার আর কমলের শৃঙ্খলও খুলে দিয়েছেন এবং রামহরিও অল্প চেষ্টাতেই নিজের সোনার বাঁধন ছিড়ে ফেলেছে।

সেপাইদের দলপতি পায়ে পায়ে পিছু হটতে হটতে আবার বললে, 'ভং ভং—ভংকা।

বিমলকে বন্দুকে নতুন টোটা পুরতে ব্যস্ত দেখে কুমার এগিয়ে এসে দলপতিকে লক্ষ্য করে আবার বন্দুক ছুঁড়লে।

শুন্য দু-হাত ছড়িয়ে দলপতিও ঘরের মেঝের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

কুমার ফের বন্দুক ছুড়লে,—পর মুহুর্তে বামন-সেপাইরা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মেরে সেখান থেকে অদৃশ্য হল;–সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্ণভেদী তীব্র শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠল—ঠিক যেন দশ-বারোটা রেলের ইঞ্জিন একসঙ্গে 'কু' দিচ্ছে ।

বিনয়বাবু চমকে বললেন, ও কিসের শব্দ?

বিমল বললে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না? হঠাৎ ঢং ঢং করে ঘন-ঘন ঘন্টার শব্দ শোনা গেল—সেই 'কু' শব্দও তখনো থামল না।

সকলে সবিস্ময়ে দেখতে পেলে, দলে দলে বামন উড়োজাহাজের এক প্রান্তে ছুটে যাচ্ছে, তাদের সকলের মুখে-চোখে ফুটে উঠেছে কি-এক অজ্ঞাত ভয়ের রেখা।

কমল বললে, ওদের দেখে মনে হচ্ছে, ওরা যেন হঠাৎ কি একটা বিপদে পড়েছে।

বিমল বললে, হ্যাঁ, সেই ভয়ে ওরা এতটা ভেবড়ে পড়েছে যে, আমাদের দিকে ফিরেও তা কাচ্ছে না।

বিনয়বাবু এগিয়ে গিয়ে ঘরের একটা দেওয়াল খানিকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। তারপর ফিরে বললেন, বিমল, ব্যাপার যা হয়েছে আমি তা বোধহয় বলতে পারি। উড়োজাহাজের দেওয়াল আমাদের বন্দুকের গুলিতে ছ্যাদা হয়ে গেছে। ঐ যে 'কু' শব্দ হচ্ছে, ওটা বাইরে থেকে বাতাস ঢোকার শব্দ। বামনরা সেই ছ্যাদা মেরামত করছে।

কুমার বললে, কিন্তু এই উড়োজাহাজের দেওয়াল কি এমন পলকা যে, সামান্য বন্দুকের গুলিতে ভেঙে গেল?

বিনয়বাবু বললেন, বোধহয় দৈবগতিকে কোন জোড়ের মুখে বা অস্থানে বন্দুকের গুলি লেগেছে।

বিমল বললে, ভারি ভারি জিনিসের ভার বইতে পারলেও হয়ত এই উড়োজাহাজ বন্দুকের গুলির চোট সইতে পারে না।

বিনয়বাবু বললেন, তাও অসম্ভব নয়,--কি-রকম উপাদানে এই উড়োজাহাজ তৈরী তা তো আমরা জানি না।

কুমার বললে, এখন আমাদের কর্তব্য কী? আমরা বামনদের হত্যা করেছি, ওরাও নিশ্চয় এর প্রতিশোধ নিতে আসবে।'

বিনয়বাবু বললেন, ওরা কী করবে তা আমি জানি না। তবে, যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছে, তখন আর নরম হওয়াও চলবে না, কারণ এখন আত্মসমর্পণ করলেও ওরা বোধহয় আমাদের ক্ষমা করবে না।

বিমল বললে, আমার মনে হয় ওরা আর সহজে এদিকে ঘেঁষবে না, কারণ ওরা আমাদের বন্দুকের শক্তি বুঝে গেছে।

বিনয়বাবু বললেন, ভবিষ্যতের কথা পরে ভাবা যাবে। আমাদের এখন সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে, যে মানুষগুলি বন্দী হয়ে আছে তাদের স্বাধীন করে দেওয়া। তাহলে আমরা দলেও রীতিমত পুরু হব, আর ওদের আক্রমণেও বেশ বাধা দিতে পারব।

রক্ত-তারকার রহস্য

বন্দীদের ভিতরে ভদ্রশ্রেণীর লোক কেউ ছিল না—বেশীর ভাগই পূর্ববঙ্গের মুসলমান খালাসী, বিলাসপুর থেকে যার স্টীমারের সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছিল। বন্দীরা মুক্তলাভ করে বিনয়বাবুদের চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে মনের খুসিতে জয়ধ্বনি করে উঠল।

বিনয়বাবু সকলকে সম্বোধন করে বললেন, দেখ, এ জয়ধ্বনি করবার সময় নয়। আমি যা বলি, তোমরা সবাই মন দিয়ে শোন। আমরা সকলেই এক ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়ে আছি। যে-কোন মুহূর্তে আমাদের প্রাণ যেতে পারে। বিপদে পড়লে বাঘে-গরুতেও একসঙ্গে জল খায়, সুতরাং বড়-ছোট নির্বিচারে আমাদেরও এখন এক মন, এক প্রাণ হয়ে কাজ করতে হবে। কাজেই এটা আমি অনায়াসেই আশা করতে পারি যে তোমরা কেউ আমার কথার অবাধ্য হবে না।

তারা সকলেই একসঙ্গে বলে উঠল, আপনার কথায় আমরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজি আছি।

বিনয়বাবু বললেন, যাদের আশ্রয়ে আমরা থাকতে বাধ্য হয়েছি তারা এখন আমাদের পরম শত্রু। অথচ তারা অন্ন-জল না দিলে আমরা প্রাণে বাঁচব না। অতএব এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, অন্ন-জলের ব্যবস্থা করা।

বিমল বললে, কিন্তু কী করে সে ব্যবস্থা হবে?

বিনয়বাবু বললেন, ঐ দেখ, বামনরা সবাই দূর থেকে আমাদের ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ করছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের বন্দুকের মহিমা দেখে ওরা বিলক্ষণ ভয় পেয়েছে, আর সেইজন্যেই এদিকে এগুতে সাহস করছে না। কিন্তু প্রবাদে যখন বলে যে, পর্বত মহম্মদের কাছে না এলে মহম্মদই পর্বতের কাছে যেতে পারেন তখন আমরাই বা ওদের কাছে যেতে পারব না কেন? তোমরা

সবাই আমার সঙ্গে এস। ভালো কথায় ওরা যদি আমাদের খাবার না দেয়, তাহলে আমরা আবার যুদ্ধ ঘোষণা করব।

সব-আগে বিনয়বাবু, তার পিছনে বন্দুক বাগিয়ে বিমল আর কুমার, তার পরে বাকি সবাই দলে দলে অগ্রসর হল।

বামনরাও দলবদ্ধ হয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে ভয় ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে সমস্ত দেখতে লাগল।

বিনয়বাবু দল ছেড়ে একটু এগিয়ে গিয়ে,পেটে ও মুখে হাত দিয়ে আহারের অভিনয় করে ইসারায় জানালেন যে তারা সবাই ক্ষুধার্ত, অবিলম্বেই খাদ্যদ্রব্য আনতে হবে। বামনরা খানিকক্ষণ ধরে পরস্পরের সঙ্গে কি পরামর্শ করলে। তারপর একজন বামন এগিয়ে এসে তেমনি ইসারায় বুঝিয়ে দিলে যে, তারা শীঘ্রই সকলের জন্যে খাদ্যদ্রব্য পাঠিয়ে দেবে।

বিনয়বাবু আনন্দিত কণ্ঠে বললেন, যাক, খাবার চাইতে এসে এটাও বেশ বোঝা গেল যে, বামনরা আমাদের আর ঘাটাতে চায় না। এ-অবস্থায় ওদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতেও বিশেষ বেগ পেতে হবে না...হু, সকলেই শক্তের ভক্ত! এস বিমল, আমরা সেই পুকুরচৌবাচ্চার ধারে, বটগাছের তলায় গিয়ে বিশ্রাম করি গে।

সকলে আবার অগ্রসর হলেন। খানিক দূরে যেতেই বিলাসপুরের বটগাছ পাওয়া গেল।—তার ডালে বসে বানররা মানুষ দেখে আবার আনন্দে কলরব করে উঠল।

বিনয়বাবু চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর উড়োজাহাজের স্বচ্ছ আবরণের ভিতর দিয়ে একবার নিচের দিকে ও একবার উপর দিকে তাকিয়ে বললেন, বিমল, দেখ।

কী বিনয়বাবু?

নিচের দিকে কী দেখছ?

ধু-ধু শূন্য!

এই শূন্যতার অর্থ বুঝতে পারছ কি? পৃথবী আর দেখা যাচ্ছে ন,—আমরা এখন অন্য গ্রহে যাচ্ছি। উড়োজাহাজ স্বদেশে ফিরছে।

বিমল স্তম্ভিত ও স্তব্ধভাবে নিচের সেই বিরাট শূন্যতার দিকে তাকিয়ে রইল—যে শূন্যতার মাঝখানে তাদের সকলকার মা, পৃথিবীর শ্যামল মুখ হারিয়ে গেছে, হয়ত এ-জীবনের মত।

বিনয়বাবু আবার বললেন, উপর-পানে তাকিয়ে দেখ। বিমল মাথা তুলে দেখে বললে, উপরেও তো দেখছি শুধুই শূন্যতা ...না, না, একটা রাঙা বড় তারা জলজল করছে।

হ্যাঁ, ঐ হচ্ছে মঙ্গল গ্রহ। ওর ঐ রাঙা রঙ দেখেই যুরোপে সেকালের লোকেরা মঙ্গলকে যুদ্ধ-দেবতার পদে অভিষিক্ত করেছিল মঙ্গল গ্রহ আকারে খুব ছোট, পণ্ডিতেরা হিসাব করে বলেছেন, মঙ্গলের আড়াআড়ি মাপ চার হাজার আটশো মাইলের বেশী নয়, ওর উপরটা পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগের চেয়ে কিছু বেশী মাত্র।

অনেক উর্ধ্বে সীমাহীন রহস্যের মায়া-রাজ্যে সেই রক্ত-তারক। এক বিপুল দানবের ক্রুদ্ধ নেত্রের মত জ্বলতে লাগল—সকলে বিস্মিতভাবে তার পানে নীরবে তাকিয়ে রইল।

বিনয়বাবুর ডায়েরি

কদিন কেটে গেল,—ঠিক কয় দিন, তার কোন হিসাব আমি রাখিনি। এই কদিন ধরে উড়োজাহাজের একটু বিশ্রাম নেই—সে হু-হু করে শূন্যের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত ভেসে চলেছে—মিনিটে কত মাইল করে তাও জানবার কোন উপায় নেই। তবে এটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে মঙ্গল গ্রহের এই বিচিত্র-উড়োজাহাজের গতি পৃথিবীর যে-কোন উড়োজাহাজের চেয়ে ঢের বেশী—কারণ মাথার উপরকার ঐ রক্ত-তারাটি ক্রমেই দেখতে বড় হয়ে উঠছে।

বামনরা আমাদের সঙ্গে আর কোন গোলমাল করেনি, তারা রোজ খাবারের যোগান দিয়ে যাচ্ছে এবং আমরাও নির্বিবাদে তার সদ্ব্যবহার করছি। তবে, তারা আর আমাদের কাছে ঘেঁষতে সাহস করে না, খাবারের পত্রগুলো খুব তফাতে রেখেই আস্তে আস্তে সরে পড়ে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, আমাদের বন্দুকের শক্তি দেখে তারা রীতিমত শায়েস্তা হয়ে গেছে। তারা আমাদের উপরে পাহারা দেয় বটে, কিন্তু তাও খুব দূর থেকে, লুকিয়ে লুকিয়ে।

এরা যে এত শীঘ্র পৃথিবীর আবহাওয়া ছেড়ে পিঠটান দিচ্ছে, তারও কারণ বোধহয় আমাদের বিদ্রোহ। আমাদের বন্দুকের গুলিতে উড়োজাহাজ ফুটে হয়ে যাওয়াতেই নিশ্চয় তারা এতটা ভয় পেয়েছে। পাছে আমরা কোন নতুন বিপদ ঘটাই, সেই ভয়েই বামনরা আজকাল চুপচাপ আছে বটে, কিন্তু মঙ্গল গ্রহে ফিরে যাবার পর এরা যে আমাদের সঙ্গে কি-রকম ব্যবহার করবে, তা ভগবানই জানেন।

এ-জীবনে হয়ত আর পৃথিবীতে ফিরতে পারব না। সেইজন্যেই এই ডায়েরি লিখতে সুরু করেছি। আমাদের জীবনের উপর দিয়ে কী আশ্চর্য ঘটনার প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, তার একটা লিখিত ইতিহাস থাকা নিতান্ত দরকার। যদিও

সেটা সম্ভব নয়,—তবুও আমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনগতিকে আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারে, তাহলে আমার এই ইতিহাস মানুষের অনেক উপকারে লাগবে।

কিন্তু এত বিপদেও আমার মনে আনন্দ হচ্ছে। যে মঙ্গল গ্রহ লিয়ে আমি আজীবন আলোচনা করে আসছি, যার জন্যে পৃথিবীর সর্বত্র কত তর্ক, কত সন্দেহ, কত জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে, এবারে আমি সশরীরে তারই মধ্যে গিয়ে বিচরণ করতে পারব। আমি কী ভাগ্যবান!

খুব শীঘ্রই আমরা যে-গ্রহে গিয়ে অবতীর্ণ হব, তার পরিচয় জানি বলেই আমার বিশেষ কিছু ভয় হচ্ছে না। কিন্তু বিমল, কুমার ও কমল বোধহয় অত্যন্ত দুর্ভাবনায় পড়েছে। আর রামহরির তো কথাই নেই, সে সর্বদাই জড়ভরতের মত এক কোণে বসে থাকে, কারুর সঙ্গে কথাবার্তা পর্যন্ত কইতে চায় না।

তাদের আশ্বস্ত করবার জন্যে সেদিন বললুম, আচ্ছা, তোমরা এতটা বিমর্ষ হয়ে আছ কেন বল দেখি? তোমাদের বিশেষ ভয় পাবার কোন কারণ তো দেখি না।

বিমল বললে, বিনয়বাবু, আমাদের মত অবস্থায় পড়লে পাগল ছাড়া আর কেউ খুসি হতে পারে না। জলের মাছকে ডাঙায় তোলবার সময়ে মাছের কি খুসি হতে পারে? আমাদেরও অবস্থা কি অনেকটা সেইরকম হয়নি? আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি, কোন সৃষ্টিছাড়া বিপদের রাজ্যে, কে তা বলতে পারে?

আমি বললুম, আমরা যে মঙ্গল গ্রহে যাচ্ছি সে কথা তো আগেই তোমাদের বলেছি। মঙ্গল গ্রহে যখন জীবের বসতি আছে, তখন তোমাদের এতটা চিন্তিত হবার কোনই কারণ নেই। মঙ্গল গ্রহের ভিতরের অবস্থা অনেকটা পৃথিবীরই মতন। সেখানেও যে পৃথিবীর মত বায়ুমণ্ডল আছে, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। মঙ্গল গ্রহে কুয়াশা আর মেঘ যখন আছে তখন পৃথিবীর জীবদের সবআগে যা দরকার সেই বায়ুমণ্ডলও নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং জলের মাছের

ডাঙায় পড়ার মত অবস্থা আমাদের কখনই হবে না, সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিত থাকো।

কমল বললে, কিন্তু মঙ্গল গ্রহের রঙ, অমন রাঙা কেন?

আমি বললুম, পণ্ডিতরা দেখেছেন মঙ্গলের পাঁচ ভাগের তিন ভাগই হচ্ছে মরুভূমি—সেখানে জল বা ফল-ফসল কিছুই নেই, খালি ধু ধু করছে লাল বালি আর লাল বালি। এই লাল বালির মরুভূমির জন্যেই মঙ্গলকে অমন রাঙা দেখায়।

আরো কতগুলো দিন একভাবেই কেটে গেল। এখন আমরা পৃথিবীর আকর্ষণের মধ্যে ও নেই—এখন কেবল মঙ্গল আমাদের টানছে —মঙ্গলের আকারও মস্ত বড় হয়ে উঠেছে, আর এখন তাকে দেখতে হলে উপর দিকে নয়, নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে হয়।

সেদিন রাত্রে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলুম। দূরে, বহু দূরে—মাথার উপরে জেগে উঠল উজ্জ্বল পৃথিবী, যেন চাঁদের মতন! আমার মনে হল, মা যেমন কোলের ছেলের মুখের উপরে মুখ এনে নত নেত্রে চেয়ে রাত জেগে বসে থাকেন, পৃথিবীও আমাদের পারে ঠিক সেইভাবেই মেহমাখা দরদভরা চোখে নির্ণিমেষে তাকিয়ে আছে।

উড়োজাহাজের সমস্ত বন্দীদের ডেকে সেই দৃশ্য দেখালুম। সকলেই দুঃখিতভাবে কাতর আগ্রহের সঙ্গে অথচ গভীর বিস্ময়ে মা পৃথিবীর উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করল, কেউ কেউ আবার চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিলে,—আমারও মনটা যেন কেমন কেমন করতে লাগল।...হায়, আর কি ঐ মায়ের কোলে গিয়ে উঠতে পারব?

জোড়া চাঁদের মুল্লুকে

ঐ মঙ্গল গ্রহ! আগেকার চেয়ে অনেক কাছে, কিন্তু এখনো বহু দূরে।

বামনরা এখনো আমাদের কাছে ঘেঁষে না,—আমরা তাদের সঙ্গে মেলামেশার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাদের দিকে এগুলেই তারা পালিয়ে গিয়ে কোন একটা কামরায় ঢুকে পড়ে, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। অথচ আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্যে এখন দূরে দূরে চারদিকে সশস্ত্র পাহারারও অভাব নেই।

বিমল সেদিন দৈবগতিকে একটা বামনকে ধরে ফেলেছিল। কিন্তু ধরবামাত্র বামনটা মহা আতঙ্কে বিকট এক চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বিমল তখন বাধ্য হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে এল।

আজ আমাদের এক পরামর্শসভা বসেছিল। বিমল, কুমার, কমল, রামহরি এবং অন্তান্ত বন্দীদের ডেকে আমি বললাম, দেখ, শীঘ্রই আমরা মঙ্গল গ্রহে গিয়ে উপস্থিত হব। বামনরা এখন ভয়ে আমাদের কিছু বলছে না বটে, কিন্তু স্বদেশে গিয়ে তারা যে আমাদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করবে, তার কিছুই স্থিরতা নেই। তখন তার দলে ভারি হবে, কেবলমাত্র দুটো বন্দুক দেখিয়ে আমরা বেশীদিন তাদের ভয় দেখাতেও পারব না। কাজেই তখন আমাদের প্রতি পদেই সাবধান হয়ে থাকতে হবে । মঙ্গল গ্রহে গিয়ে তোমরা কেউ যেন দলছাড়া হয়ে না,—সকলে সর্বদাই একসঙ্গে থেকে, একসঙ্গে ওঠাবসা চলা-ফেরা কোরো। যা করবে সকলকে জানিয়ে করবে। এ ছাড়া আমাদের আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নেই।

আরো কয়েকদিন গেল। মঙ্গল গ্রহ এখন আমাদের চোখের উপরে বিরাট একখানা থালার মতন ভেসে উঠেছে। সেখানে পৌছতে বোধহয় আর একদিনও লাগবে না।

আজ সকালে উঠে দেখলুম, ঘন মেঘ ও কুয়াশার ঘোমটায় মঙ্গল গ্রহের মুখ ঢাকা। মাঝে মাঝে সে ঘোমটা সরে যাচ্ছে, আর ভিতর থেকে লাল, সবুজ বা সাদা রঙের আভা ফুটে উঠছে। ঐ লাল রঙ নিশ্চয় মরুভূমির, এবং সবুজ ও সাদা রঙ আসছে বোধহয় মঙ্গলের চাষ-ক্ষেত, অরণ্য ও মেরুদেশের তুষার-রাশি থেকে।

মঙ্গলের বয়স পৃথিবীর চেয়ে ঢের বেশী। তার ভিতরে যে-সব নদ-নদী-সমুদ্র ছিল, তা এখন শুকিয়ে গেছে। পণ্ডিতদের মতে, একদিন পৃথিবীরও এই দশা হবে। জলের অভাবে জীব বাঁচতে পারে না—সৃষ্টির প্রথম জীবের জন্ম হয়েছে জলের ভিতরেই। কাজেই মঙ্গলের বামনরা আত্মরক্ষার জন্যে শেষ একমাত্র উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। মঙ্গলেরও মেরু-প্রদেশে পৃথিবীর মত তুষারের রাজ্য আছে। মঙ্গলের বাসিন্দার শত শত ক্রোশ ব্যাপী খাল কেটে সেই বরফ-গলা জল নিয়ে এসে চাষ-আবাদ করে। এমন খাল তারা দুটো-একটা নয়—কেটেছে অসংখ্য ।

পৃথিবীর মত মঙ্গলও সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং ঘোরা শেষ করতে সে পৃথিবীর চেয়ে প্রায় দু-গুণ সময় নেয়,—অর্থাৎ ৬৮৭ দিন। সুতরাং আমাদের প্রায় দুই বৎসরে হয় তার এক বৎসর। এর দ্বারা আরো বোঝা যাবে, মঙ্গল প্রতি দুই বৎসর দুই মাস অন্তরে একবার করে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর কাছে আসে। সে সময়ে প্রায় ছয় মাস কাল সে পৃথিবীর চোখের সামনে থাকে, তারপর আবার হাজার হাজার ক্রোশ দূরে, সূর্যের ওপারে অদৃশ্য হয়ে যায়। মঙ্গলের দিন আমাদের দিনের চেয়ে সাঁইত্রিশ মিনিটের চেয়ে কিছু বেশী।

কাল একটা ব্যাপার দেখে বিমল,কুমার আর কমল ভারি অবাক হয়ে গেছে। আমি কিন্তু মোটেই আশ্চর্য হইনি, কারণ ব্যাপারটা আমার আগে থেকেই জানা ছিল।

ব্যাপারটা এই—মঙ্গল গ্রহে একজোড় চাঁদ আছে। একটির নাম 'ফোবোস'—মঙ্গলের ঠিক মাঝখান থেকে সে ৫,৮০০ মাইল দূরে থাকে। প্রতি সাত ঘণ্টা উনচল্লিশ মিনিটে সে একবার করে মঙ্গলের চারদিকে ঘুরে আসে—অর্থাৎ প্রতিদিনে তিনবার করে। ফোবোসের উদয় হয় পুর্বদিকে নয়, মঙ্গলের পশ্চিম দিকে এবং চারঘণ্টা পরে পূর্বদিকে সে অস্ত যায়। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে খণ্ড থেকে পূর্ণ বা পূর্ণ থেকে খণ্ড চাঁদের রূপ ধারণ করে।

আর এক চাঁদের নাম "ডিমোস'—মঙ্গল থেকে এর দূরত্ব আরো বেশী—১৪,৬০০ মাইল। প্রতি ত্রিশ ঘণ্টা আঠারো মিনিটে সে একবার করে মঙ্গলের চারদিকে ঘুরে আসে। প্রতি তিন দিন অন্তর সে অস্ত যায় এবং এরই মধ্যে তার আকার খণ্ড থেকে পূর্ণ চাঁদের মত হয়ে ওঠে। এর উদয় হয় পুর্বদিকেই।

ফোবোস আর ডিমোস আকারে পৃথিবীর চাঁদের চেয়ে ঢের বেশী ছোট। 'ডিমোসে'র চেয়ে 'ফোবোসে'র আকার কিছু বড়—তার আড়াআড়ি মাপ প্রায় সাত মাইল। 'ডিমোসে'র আড়াআড়ি মাপ পাঁচ কি ছয় মাইল। এই জোড়া চাঁদ কিন্তু মঙ্গলের রাত্রের অন্ধকারকে দূর করতে পারে না। কারণ আমাদের পৃথিবীর পূর্ণ চাঁদের ষাট ভাগের এক ভাগ আলো নিয়ে 'ফোবোসের কারবার, আর, "ডিমোস' দেয় তার বারোশো ভাগের এক ভাগ মাত্র আলো।

মঙ্গলের মেঘরাজ্য পার হয়ে আমরা আরো নিচে নেমে এসেছি—আমাদের চোখের উপরে জেগে উঠেছে এক কল্পনাতীত দৃশ্য।

পায়ের তলায় দেখা যাচ্ছে ধুধু মরুভূমি এবং তার উপর দিয়ে হু-হু করে বয়ে যাচ্ছে রোদের তপ্ত রাঙা বালির ঝড়। সে ঝটিকাময়ী মরুভূমির যেন আদি-অন্ত নেই। মরুভূমির বুক ভেদ করে সারি-সারি খাল, তাদের সংখ্যা গণনায়

আসে না। স্থানে স্থানে যেন খালের জাল বোনা রয়েছে, কোথাও একটা খালের উপর দিয়ে আর একটা খাল আড়াআড়িভাবে কাটা হয়েছে, আবার কোথাও বা জোড়া জোড়া খাল পাশাপাশি চলে গেছে—আকার দেখলে বেশ অনুমান করা যায় যে, লম্বায় কোন কোন খাল তিনচার হাজার মাইলের কম নয়। সোজাসুজিভাবে এতগুলো সুদীর্ঘ খাল কাটা যে কিরকম পরিশ্রম সাধ্য ব্যাপার তা ভাবলেও স্তম্ভিত হতে হয় । আর এ কাজ হচ্ছে ঐ বামন জীবদের। ধন্য তাদের বুদ্ধি, ধষ্ঠ তাদের শক্তি!

যেখান দিয়েই খাল গিয়েছে, সেইখানেই তার দুই পাশে শ্যামল বনের রেখা। উড়োজাহাজ আরো নিচে নামলে পর দেখলুম, স্থানে স্থানে অনেক ঘরবাড়ী রয়েছে, নিশ্চয়ই সেগুলো নগর। মাঝে মাঝে ছোট-বড় পাহাড়ও চোখে পড়ল ।

খানিক পরেই উড়োজাহাজ একটা বড় শহরের উপরে এসে যুরে ঘুরে নামতে লাগল। নিচের শহর থেকে ঘন ঘন ঘণ্টা ও ভেরীর ধ্বনি ও বহু কণ্ঠের চীৎকার শুনতে পেলুম,—চেয়ে দেখলুম, শহরের প্রত্যেক বাড়ীর ছাদের উপরে ও পথে পথে বামনদের জনতা । হঠাৎ শহর থেকে আরো কুড়ি-পঁচিশখানা ছোট ছোট উড়োজাহাজ আমাদের দিকে উড়ে এল—আগ বাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে।

আমি ফিরে বললুম, বিমল, তোমরা সব প্রস্তুত হও, এইবারে আমাদের নামতে হবে।

বিমল বন্দুকটা একবার নেড়ে-চেড়ে পরখ করে, কাঁধের উপরে রেখে বললে, আমি প্রস্তুত।

***বিনয়বাবু স্বয়ং মঙ্গল গ্রহের যে বর্ণনা লিখেছেন, আমাদের কথার চেয়ে তা বেশী চিত্তাকর্ষক হবে বলে আমরা এবার থেকে তার ডায়েরির লেখাই তুলে দেব। বিনয়বাবুর ডায়েরিতে মঙ্গল গ্রহের যে-সব অদ্ভূত তথ্য আছে, তার অধিকাংশই প্রমাণিত সত্য, যাদের বিশ্বাস হবে না, তারা এ-সম্বন্ধে সিয়াপ্যারেলি,

লাওয়েল, গান, স্ট্যানলি উইলিয়মস ও শ্লামেরিয়ন প্রভৃতি বিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতামত পড়ে দেখতে পারেন —ইতি লেখক।

এক লাফে সাগর পার

উড়োজাহাজ একটা শহরের প্রান্তে এসে নামল। সঙ্গে সঙ্গে শহরের ভিতর থেকে কাতারে কাতারে বামন এসে উড়োজাহাজের চারিদিক ঘিরে ফেললে। তাদের গোল-গোল ভাটার মতে চোখগুলো আগ্রহে ও বিস্ময়ে আরো বিস্ফারিত হয়ে উঠল এবং তাদের সকলেরই মুখে একই জয়ধ্বনি—'হংচ হং-হংচা হং।

উড়োজাহাজের একদিককার প্রধান দেওয়ালটা অনেকখানি সরে গেল এবং সেইখানে একদল বামন-সেপাই বর্শা তুলে দুইধারে সার বেঁধে দাঁড়াল—যাতে বাইরের বামনরা হুড়মুড় করে ভিতরে না ঢুকে পড়তে পারে।

কেবল একজন বামন-বোধহয় সে উড়োজাহাজের কর্তা— এগিয়ে গিয়ে নিচে নেমে পড়ল। বাইরে জনতার ভিতর থেকেও তিনজন জমকালো-পোশাক-পরা বামন বেরিয়ে এসে দাঁড়াল ।

আমরা সবাই এক জায়গায় দল বেঁধে দাঁড়িয়ে বামনদের কাণ্ড দেখতে লাগলুম।

বিমল বললে, দেখুন বিনয়বাবু, ওরা কথা কইতে কইতে ক্রমাগত আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

আমি বললুম, বোধহয় আমাদেরই কথা হচ্ছে। তোমরা কেউ ব্যস্ত হয়ে না—শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে দেখ, কোথাকার জল কোথায় দিয়ে দাঁড়ায়।

উড়োজাহাজের কর্তা হঠাৎ একটা ভেরীতে জোরে ফুঁ দিলে এবং বোধহয় তাহার উত্তরেই শহরের ভিতর থেকেও আর একটা ভেরীর তীব্র আওয়াজ হল। তার একটু পরেই দেখা গেল শহর থেকে পঙ্গপালের মতন দলে দলে বামন-সেপাই বেগে বেরিয়ে আসছে।

কুমার সভয়ে বলে উঠল, এইবারে ওরা আমাদের আক্রমণ করবে।

আমি বললুম, আমরা যদি ওদের কথা শুনি, তাহলে ওরা নিশ্চয়ই আক্রমণ করবে না।

বিমল বললে, বিনয়বাবু, দেখুন—দেখুন। সেপাইদের সঙ্গে প্রকাও কি-একটা যন্ত্র আসছে। ওটা কি এদেশী কামান?

তাই তো, মস্তবড় একটা ঘন্টার মত কী ওটা? উঁচুতে সেটা পঞ্চাশ-ষাট ফুট ও চওড়ায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুটের কম নয় এবং যন্ত্রটা টেনে আনছে কতকগুলো অদ্ভুত আকারের জন্তু! এ জন্তুগুলোকে দেখতে অনেকটা উটের মত, তবে উটদের শিং থাকে না, কিন্তু এদের প্রত্যেকের মাথায় একটা করে খুব লম্বা শিং আছে। আর এদের আকারও উটের চেয়ে অনেক ছোট এবং গায়ের বর্ণও মিশমিশে কালে। এগুলো মঙ্গল গ্রহের গরু, না ঘোড়া?

উড়োজাহাজের কাছে এনে যন্ত্রটা দাঁড় করানো হল। দেখলুম তার তলায় চারখানা বড় বড় চাকা রয়েছে। পাশে দাঁড়িয়ে একজন বামন কি-একট। কল টিপে দিলে, অমনি সেই ঘণ্টার মতন যন্ত্রটা উপরপানে উঠে এমনভাবে কাত হয়ে রইল যে, তার গর্তের দিকটা এল উড়োজাহাজের দিকে।

ধাঁ করে আমার মাথায় একটা সন্দেহ জেগে উঠল। যে-রকম শোষক-যন্ত্রের সাহায্যে বামনরা আমাদের পৃথিবী থেকে ধরে এনেছে, এটাও তারই রূপান্তর নয় তো?...নিশ্চয়ই তাই!

বিমলকে বললুম, বিমল, তোমার বন্দুকের জারিজুরি আর খাটছে না। এরা আবার একটা নতুন রকম শোষক যন্ত্র এনেছে।

বিমল বললে, কেন, কী মতলবে?

আমরা যদি ওদের কথামত কাজ না করি, তাহলে ওরা ঐ যন্ত্র দিয়ে আবার আমাদের শুষে নেবে। ও যন্ত্রের শক্তি দেখেছ তো!

বিমল বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে বললে, তাহলে আপাতত বামনদের কথামতই কাজ করা যাক—কী বলেন?

নিশ্চয়ই। ওদের কথা শুনলে আমাদের লাভ বই লোকসানও তো নেই।

কিন্তু ওরা যদি আবার কুকুর-বিড়ালের মত আমাদের বন্দী করে রাখবার চেষ্টা করে?

উপায় নেই।

বিমল ম্লান মুখে স্তব্ধ হয়ে রইল। ইতিমধ্যে একদল বামনসেপাই ভয়ে ভয়ে আমাদের দিকে খানিক এগিয়ে এল, তারপর তফাত থেকেই ইসারা করে আমাদের উড়োজাহাজ ছেড়ে নামতে বললে।

সকলের আগেই সুবোধ বালকের মত বিমল অগ্রসর হল। বাইরে হাজার হাজার বামন-সেপাই হাজার হাজার সোনার বর্শা তুলে প্রস্তুত হয়ে রইল—একটু বেগতিক দেখলেই আমাদের আক্রমণ করবে।

উড়োজাহাজ থেকে নামবার জন্যে এক জায়গায় প্রায় তিনফুট উঁচু একখানা মই লাগানো ছিল। বিমলের মাথায় কি খেয়াল হল, সে মই দিয়ে না নেমে, একটি লাফ মেরে নামতে গেল—কিন্তু পর-মুহূর্তেই তার দেহ মাটি থেকে প্রায় পনেরো হাত উঁচুতে গিয়ে উঠল এবং তারপর প্রায় ত্রিশ হাত তফাতে, বামন-সিপাইদের মাঝখানে ধুপ করে গিয়ে পড়ল।

বামনরা সবাই মহাবিস্ময়ে ও আতঙ্কে চীৎকার করে বিমলের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। এমন ব্যাপার বোধহয় তারা জীবনে কখনো দেখেনি।

আমরাও সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলুম—এ কী অমানুষিক কাণ্ড!

পলায়ন

বিস্ময়ের প্রথম চমকটা কেটে যাবার পরেই একটা মস্ত কথা আমার মনে পড়ে গেল—মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ হচ্ছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের একশো ভাগের আটত্রিশ ভাগ মাত্র। অর্থাৎ পৃথিবীতে যার ওজন হবে একশো সের, মঙ্গলে তার ওজন আটত্রিশ সেরের চেয়ে বেশী হবে না। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের চাপও পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগের বেশী নয়।

বিমলের এই আশ্চর্য লম্ফত্যাগের গুপ্ত রহস্য আমি অল্প কথায় যারা বুঝতে পারলে তাদের বুঝিয়ে দিলুম।

এদিকে বামনরা সবাই মনে করলে, বিমল তাদের আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। তখনি একদল বামন বিমলের দিকে বেগে ছুটে গেল, আর একদল এগিয়ে এল সেই ভীষণ শোষক-যন্ত্র নিয়ে আমাদের দিকে।

মনে মনে আমি প্রমাদ গুণলুম। আবার ঐ ভয়ানক যন্ত্র যদি আমাদের গ্রাস করে, তাহলে আর আমরা বঁচিব না। বাঁচলেও চিরকাল শিকল-বাধা জন্তুর মত কারাগারে বাস করতে হবে ।

কুমার তার বন্দুক তুললে। আমি বললুম, রাখ তোমার বন্দুক। যদি বাঁচতে চাও, পালাও।

পালাব? কোথায় পালাব?

বাইরে লাফ মারো।

বামনরাও তো আমাদের পিছনে আসবে।

এলেও ওরা আমাদের মত লাফ মারতে পারবে না। দেখলে না, বিমলের লাফ মারবার ক্ষমতা দেখে ওরা কিরকম হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। আর কথা নয়-দাও লাফ।

এই বলেই বাইরের দিকে আমি দিলুম এক লাফ। সেই এক লাফেই আমি একেবারে তিনতলার সমান উঁচুতে উঠে প্রায় চল্লিশ হাত জমি পার হয়ে গেলুম। নামবার সময় ভাবলুম, এত উঁচু থেকে পড়ে হয়ত আমার হাড়গোড় গুড়িয়ে ছাতু হয়ে যাবে। কিন্তু যখন ফের মাটিতে এসে অবতীর্ণ হলুম, তখন টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলুম বটে, কিন্তু দেহের কোথাও একটুও চোট লাগল না। আমি মাটি থেকে উঠতে না উঠতেই আমার চারপাশে ধপাধপ করে আমার অস্তান্ত সঙ্গীরা ঠিক ল্যাজকাটা হনুমানের মতন একে একে মাটির উপরে এসে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল। সে এক অবাক কাণ্ড। --আমাদের কাছাকাছি যত বামন ছিল, তারা তো ভয়ে কোথায় চম্পট দিলে তার কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

আমরা উঠে আবার এক-এক লাফ মারলুম—আবার অনেকটা তফাতে গিয়ে পড়লুম। তার পরেই দেখি, সামনে একটা চওড়া খাল—যার জল আসছে সুদূর মেরুর তুষার-সাগর থেকে। পৃথিবীতে থাকলে এ খাল পার হতে গেলে আমাদের সাঁতার দিতে হত, আজ কিন্তু এক-এক লাফে খুব সহজেই আমরা খাল পার হয়ে গেলুম।

বিমল যাচ্ছিল আমাদের আগে, লাফের পর লাফ দিতে দিতে।

এইভাবে অতি শীঘ্রই আমরা শত্রুদের কাছ থেকে প্রায় তিন মাইল তফাতে গিয়ে পড়লুম। তারপর লাফ মারা বন্ধ করে বিমল বললে, বিনয়বাবু, এইবারে বিশ্রাম করা যাক, বড় হাঁপ ধরছে।

পিছনে চেয়ে দেখলুম, কোনদিকে শত্রুর চিহ্ন নেই—কেবল আমাদের সঙ্গীরা মস্ত মস্ত লাফ মেরে এগিয়ে আসছে।

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, বিমল ভায়া, এখনি বিশ্রাম করলে তো চলবে না। বামনরা যদি উড়োজাহাজ নিয়ে আমাদের আক্রমণ করে, তাহলে আমরা এই খোলা জায়গায় কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারব না।

বিমল হতাশভাবে বললে, তাহলে উপায়?

রামহরি বললে, খোকাবাবু,খানিক তফাতে ঐ একটা ছোট পাহাড় রয়েছে, ওখানে হয়ত লুকোবার ঠাঁই পাওয়া যেতে পারে।

রামহরি বড় মন্দ কথা বলেনি। আমরা আবার কয় লাফে সেই পাহাড়ের কাছে গিয়ে হাজির হলুম। রামহরি মানুষ-ক্যাঙারুর মতন লাফাতে লাফাতে পাহাড়ের উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। মিনিট-পাঁচেক পর ফিরে এসে সে জানালে, পাহাড়ের ভিতরে খুব বড় একটা গুহা আছে—সেখানে আমাদের সকলের স্থান-সঙ্কুলান হতে পারে।

ঠিক সেই সময়েই আকাশে কিসের একটা শব্দ উঠল। মুখ তুলে চেয়ে দেখি, বামনদের উড়োজাহাজ। একখানা নয়, দু-খান। নয়, একেবারে বিশ-পঁচিশখান!

আমি চেঁচিয়ে বললুম, চল চল, গুহায় চল।

আবার উড়োজাহাজ

পাহাড়টা বেশী উঁচু নয়—বড়-জোর ছ'শো ফুট। তার গায়ে কোথাও গাছপালার চিহ্ন নেই। আমরা সকলে সেই কালো, স্যাড়া পাহাড়ের অলিগলি পথ দিয়ে লাফাতে লাফাতে উপরে উঠে একটা জায়গায় গিয়ে দেখলুম, সামনেই একটা মস্ত গুহা।

সব-আগে আমি ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। গুহাটির মুখ ছোট বটে, কিন্তু ভিতরটা বেশ লম্বা-চওড়া-সেখানে অন্তত একশো জন লোক অনায়াসেই হাত-পা ছড়িয়ে বাস করতে পারে।

গুহার ভিতর থেকে সবাইকে আমি চেঁচিয়ে ডাকলুম। সকলে একে-একে গুহার ভিতরে এসে ঢুকল। আমি বললুম, এখন আমরা কতকটা নিরাপদ হলুম। কমল বললে, কিন্তু আমরা খাব কী? মানুষ তো আর না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে না।

আমি বললুম, আগে উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাই, তারপর পেটের কথা ভাবা যাবে-খন।

বামনদের উড়োজাহাজগুলোর শব্দ তখন খুব কাছে এসে পড়েছে। গুহার মুখ থেকে আকাশের দিকে উকি মেরে আমি দেখলুম, অধিকাংশ উড়োজাহাজ নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে উড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ছ-খান উড়োজাহাজ এই পাহাড়ের ঠিক উপরেই ঘুরছে, ফিরছে— দানব-দেশের বিপুল দুটো ডান-ছড়ানো চিলের মত। এরা বোধহয় বুঝতে পেরেছে যে, আমরা এই পাহাড়ের ভিতরেই লুকিয়ে আছি।

হঠাৎ আবার সেই ভীষণ শব্দ জেগে উঠল—যেন হাজার হাজার শ্লেটের উপরে কার হাজার হাজার পেন্সিল ঘর্ষণ করছে।

আমি চেঁচিয়ে বললুম, সাবধান, কেউ গুহার বাইরে যেও না! বামনরা আবার শোষক-অস্ত্র ব্যবহার করছে।

একটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা গুহার ভিতরে ঢুকে সকলকে কাঁপিয়ে দিলে। আমি গুহার মুখ ছেড়ে কয়েক পা পিছিয়ে এসে দাঁড়ালুম-কী জানি বলা তো যায় না!

শব্দ আরো বেড়ে উঠল। গুহার ভিতর থেকেই দেখা গেল, পাহাড়ের গা থেকে একরাশি নুড়ি ও কতকগুলো ছোট-বড় পাথর সেই শোষক-যন্ত্রের বিষম টানে হু-হু করে শূন্যে উঠে গেল ।

বিমল সভায় বললে, বাইরে থাকলে এতক্ষণে আমাদেরও ঐ দশা হত।

আচম্বিতে শব্দটা আবার থেমে গেল—ঠাণ্ডা হাওয়াও আর বইছে না।

আমি আবার ধীরে ধীরে গুহার মুখে এগিয়ে গেলুম। মাথা বাড়িয়ে উপরপানে তাকাতেই দেখলুম, উড়োজাহাজ ছু-খানা ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের দিকে নেমে আসছে।

সকলেই তখন গুহাতলে শুয়ে বা বসে বিশ্রাম করছিল, আমার কথা শুনে সকলেই আবার লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

বিমল শুষ্ক স্বরে বললে, আসুক ওরা। আমরা যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেব, তবু ওদের হাতে আর বন্দী হব না।

অন্য সকলেও উচ্চ স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

আমি বললুম, তোমরা ঠাণ্ডা হয়ে আমার কথা শোন। আপাতত বোধহয় কারুকে প্রাণ দিতে হবে না। তোমাদের মনে আছে তো, এদের উড়োজাহাজ এমন জিনিস দিয়ে তৈরী, যা বন্দুকের গুলি সইতে পারে না। বিমল আর কুমার বন্দুক ছুড়লেই উড়োজাহাজ দু-খান নিশ্চয়ই জখম হয়ে পালিয়ে যাবে।

বিমল বললে, ঠিক কথা! কুমার, শিগগির বাইরে এস।

বিমল আর কুমার বন্দুক নিয়ে গুহার মুখে গিয়ে দাঁড়াল। আমি বললুম, তোমরা কিন্তু গুহার মুখ ছেড়ে এগিয়ে যেও না— ওরা আবার শোষক-যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে।

আমিও গুহার মুখে গিয়ে দেখলুম, উড়োজাহাজ দু-খান খুব কাছে নেমে এসেছে। বন্দুকের লক্ষ্যের মধ্যে না-আসা পর্যন্ত বিমল ও কুমার অপেক্ষা করতে লাগল।

উড়োজাহাজ আরো নিচে নেমে এল—ক্রমে আরে, আরো নিচে।

বিমল লক্ষ্য স্থির করতে বললে, কুমার, সময় হয়েছে। যে উড়োজাহাজখানা বেশী নিচে নেমেছে, ওরই ওপরে গুলি চালাও। দুজনেই পরে পরে বন্দুক ছুড়লে। সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে ঘটে। উচ্চ ও তীক্ষ্ণ শব্দ শোনা গেল-ইঞ্জিনের 'কু' দেওয়ার মত।

আমি সানন্দে বললুম, তোমরা লক্ষ্য ভেদ করেছ-সাবাস, সাবাস। ঐ শোন, উড়োজাহাজের বায়ুহীন কামরার ভিতরে বাতাস ঢোকার শব্দ হচ্ছে।'

বিমল ও কুমার উৎসাহিত হয়ে আবার বন্দুক ছুড়লে এবং বন্দুকের ধ্বনির প্রতিধ্বনি থামতে না থামতে আরো দুটো তীব্র 'কু' শব্দ যেন আকাশের বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে লাগল।

উড়োজাহাজ দু-খানা তাড়াতাড়ি উপরে উঠে তীরবেগে পলায়ন করলে।

বিমল আনন্দে লম্ফ ত্যাগ করে বললে, জয়, বন্দুকের জয়।

চতুষ্পদ পক্ষী

সূর্য অস্ত গেছে।

চারিধারে মরুভূমির রাঙা বালি, তারই মাঝখানে এই ছোট পাহাড়টি। ভাগ্যে মঙ্গলের আবহাওয়া পৃথিবীর চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা, নইলে আজ সারা দিনে আমাদের অবস্থা নিশ্চয়ই বিষম শোচনীয় হয়ে উঠত। তবু তাপ যা পাচ্ছি, তাও বড় সামান্ত নয়।

মঙ্গলের এই মরুভূমির আর এক বিশেষত্ব, এখানে জলের জন্যে একটুও ভাবতে হচ্ছে না। কারণ মরুভূমির বুক চিরে খালের পর খাল চলে গেছে, তাদের কানায় কানায় পরিষ্কার স্বচ্ছ জল টলমল করছে। পাহাড় থেকে প্রায় আধ মাইল তফাতেই একটি খাল, — আমরা মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে জলপান করে আসছি। আমাদের সঙ্গে জল রাখবার পাত্র থাকলে বারবার আনাগোনা করতেও হত না। তবে, এখানে আধ মাইল পথ যেতে বেশীক্ষণ লাগে না, কারণ এখন আমরা এক-এক লাফে অনেক দূর এগিয়ে-যেতে পারি কিনা!

খালের ধারে ধারে বন-জঙ্গল আর শস্যখেতের পর শস্যখেত। কিন্তু এখানকার গাছপালা সব ছোট ছোট-বোধহয় মাটির গুণ। একরকম গাছ এখানে খুব বেশী রয়েছে—দেখতে অনেকটা খেজুর গাছের মত এবং এইগুলোই এখানে সবচেয়ে বড় জাতের গাছ। বন-জঙ্গলের মধ্যে তিন-চার রকম পাখিও দেখলুম, কিন্তু পৃথিবীর কোন পাখির সঙ্গেই তাদের চেহারা মেলে না। একরকম পাখির আকার বড়ই অদ্ভূত। তাদের দেহ চিলের মত বড়, কিন্তু গায়ের রঙ একেবারে বেগুনি। তাদের পা চারটে করে, আর ল্যাজ ও পাখির মত নয়--হনুমানের মত লম্বা, ডগায় তেমনি লোমের গোছা। এই আশ্চর্য চতুষ্পদ পাখিগুলো আমাদের দেখেই তাড়াতাড়ি উড়ে পালিয়ে যেতে লাগল।

রাত্রি এল। আকাশে উঠল চাঁদ–কিন্তু তাদের আলো এত কম যে, অন্ধকার দূর হয় না বললেই চলে।

আজ সারা দিন অনাহারে কেটে গেল। কালও যে খেতে পাব, তার কোন আশা দেখছি না। গুহার ভিতরে প্রায় সকলেই শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, কেবল আমি, বিমল, কুমার আর কমল অন্ধকারে জেগে বসে আছি।

বিমল বললে, বিনয়বাবু, এখন উপায় কী? খালি জল আর হাওয়া খেয়ে তো প্রাণ বাঁচবে না।

আমি বললুম, এক আত্মসমর্পণ ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না। এখন মনে হচ্ছে, পালিয়ে এসে আমরা ভালো করিনি।

কুমার বললে, আর আত্মসমপণ করাও চলে না। এখন আমাদের হাতে পেলে বামনরা আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই ভালো ব্যবহার করবে না।

আমি বললুম, কিন্তু এখানে থাকলেও আমাদের তিলে তিলে শুকিয়ে মরতে হবে।

সকলেই স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল। বাইরে রাত তখন থমথম করছে। আচম্বিতে আমাদের সকলকেই স্তম্ভিত করে, মরুভূমির বুক থেকে এক বিকট চীৎকার জেগে উঠল—বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ! তার পরেই আবার সব চুপচাপ।

বিমল সচকিত স্বরে বললে, কে এখানে মানুষের ভাষায় আর্তনাদ করছে?

কুমার বললে, বামনরা কি কোন মানুষকে হত্যা করছে?

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম-এ আবার কী ব্যাপার। ফের সেই বিকট আর্তনাদ; ‘বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ!—আবার সব চুপ।

বিমল বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে যেতে উষ্ঠত হল। আমি তার হাত চেপে ধরে বললুম, যেও না।

বিমল বললে, কেন?

বুঝতে পারছ না, এ মানুষের গলার আওয়াজ নয়।

তবে এ কী?

কাল সকালে খোঁজ নিলেই চলবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিমল আবার বসে পড়ল। বাইরে, মরুভূমির ভয়-মাখানো আলো-আঁধারের দিকে তাকিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলুম ;–গভীর রাত্রে এমন নির্জন স্থানে এই রহস্যময় আর্তনাদের কারণ কী? এ আমাদের চির-চেনা পৃথিবীর নয়, এখানকার সমস্ত ব্যাপারই অপুর্ব, প্রত্যেক পদেই নব-নব বিস্ময় আর বিপরীত কাণ্ড, কাজেই কোন হদিশ না পেয়ে সে-রাত্রের মত আমি নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করলুম। ঘুমোবার আগে আর সেই নিশীথ রাতের ভীষণ আর্তনাদ শুনতে পাইনি।

পরদিন প্রভাতে বাইরে বেরিয়ে আমরা পাহাড়ের চুড়ায় বসে পরামর্শ করছি, এমন সময় কমল চেঁচিয়ে উঠল—দেখুন, দেখুন কার। সব যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি পাহাড়ের ধারে গিয়ে দেখলুম, নিচ দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন বামন সারি সারি অগ্রসর হচ্ছে। তাদের অনেকেরই মাথার উপরে এক-একটা ঝাঁকা বা মোট বা বড় বড় পাত্র, কেউ কেউ পৃথিবীর মত বাঁকও বহন করছে। বাঁকাগুলো নানারকম ফলফসলে পরিপূর্ণ। বোধহয় এর দূর গ্রাম থেকে শহরের বাজারে মাল বিক্রি করতে চলেছে। আমাদের খবর নিশ্চয়ই এরা জানে না, তাহলে কখনই এ পথ মাড়াবার ভরসা করত না!

বিমল মহা উৎসাহে বলে উঠল, ভাইসব, সামনেই খানা তৈরী! এস আমরা ওদের আক্রমণ করি। বলেই তো সে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল, আমরাও তার পিছনে পিছনে চললুম।

পাহাড় থেকে নিচে নামবামাত্রই বামনরা বিমলকে দেখতে পেল। জীবনে এই প্রথম মানুষের চেহারা দেখে প্রথমটা তারা ভয়ানক হতভম্ব হয়ে গেল।

তারপর বিমলের পিছনে অবিধি আমাদের সবাইকে দেখে তারা বিষম এক আর্তনাদ করে পালাবার উপক্রম করলে, অমনি বিমল দিলে এক তিন-তাল উঁচু লম্ফ,—সঙ্গে সঙ্গে আমরাও লাফ মারলুম।...চোখের নিমেষে আমরা তাদের মোটমাট সমস্তই কেড়ে নিলুম, তারা কোনই বাধা দিলে না, প্রাণ নিয়ে প্রাণপণে তারা যে যেদিকে পারলে পলায়ন করলে।

রামহরি এক গাল হেসে বললে, খোকাবাবু, তোমরা একেলে ছেলে, ভগবান মান না, কিন্তু এই দেখ, জীব দিয়েছেন যিনি আহার দিলেন তিনি।

অবাক কারখানা

আহারাদির পরে সবাইকে ডেকে আমি বললুম, দেখ, এ-রকম করে তো আর বেশীদিন চলবে না, এখন আমাদের কর্তব্য স্থির করতে হবে। নইলে কাল থেকে আবার অনাহার ছাড়া আর কোন উপায় তো আমি দেখছি না।

কুমার বললে, হ্যাঁ, এ পথ দিয়ে ভবিষ্যতে আর যে বামনের দল ফল-ফসল নিয়ে যাতায়াত করবে, তাও তো আমার মনে হয় না।

বিমল একটু ভেবে বললে, আজ রাত্রে একবার শহরের দিকে লুকিয়ে গেলে হয় নাভ

আমি বললুম, কেন?

বিমল বললে, বামনরা নিশ্চয়ই চুপ করে বসে নেই, আমাদের ৰন্দী করবার জন্যে তারা নিশ্চয়ই কোন উদ্যোগ-আয়োজন করছে। তারা কী করছে আগে থাকতে জানতে না পারলে পরে আমরা আত্মরক্ষা করতে পারব না।

আমি বললুম, তোমার পরামর্শ মন্দ নয়। সুবিধে পেলে শহর থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্যও লুঠ করে আনা যাবে,—কী বল?

বিমল হেসে বললে, নিশ্চয়! দলে আমরাও তো কম ভারি নই, আমরা প্রত্যেকেই শুধু হাতে আট-দশ জন বামনকে অনায়াসে বধ করতে পারি। বামনরা আমাদের মত লাফাতেও পারে না, বেগতিক দেখলে লাফিয়ে লম্বা দিলেই চলবে।

হঠাৎ বাইরে থেকে শব্দ এল—বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ।

এ সেই কালকের রাতের আর্তনাদ। আমরা সবাই তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে গেলুম, কিন্তু পাহাড়ের উপরে দাড়িয়ে মরুভূমির চারিধারে চেয়েও কোথাও জনপ্রাণীকে দেখতে পেলুম না।

রামহরি বললে, ঠিক দুপুর বেলা, ভূতে মারে ঢেল,—খোকাবাবু, এ সব ভুতুড়ে ব্যাপার। তারপরেই দূর থেকে আর এক চীৎকার শোনা গেল—ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ।

এ আবার কি, এ যে কুকুরের চীৎকার! রামহরি চোখ পাকিয়ে বললে, এ ভূত না হয়ে যায় না— কখনো মানুষের মত, কখনো কুকুরের মত চেঁচাচ্ছে। এস বাবুরা, পালিয়ে এস।

দূর থেকে কুকুরের চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে খুব কাছে, একেবারে আমাদের মাথার উপর থেকে আবার সেই আর্তনাদ শোনা গেল—

বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ!

চমকে উপরে তাকিয়ে দেখি, পাহাড়ের টঙে হনুমানের মত ল্যাজওয়ালা সেই আশ্চর্য চতুষ্পদ পক্ষী বসে আছে। সেই পাখিটাই অমন বিকট স্বরে ডাকছে।

কমল, বললে, পাখির ডাক মানুষের শব্দের মত। অবাক কারখান!

কিন্তু দূরে কুকুরের চীৎকার তখনো থামেনি। আমরা চারিদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ দেখলুম, খালের জল থেকে ডাঙায় উঠে একটা মিশমিশে কালো মস্ত জানোয়ার বেগে ছুটতে সুরু করলে। খানিক পরেই জানোয়ারটা পাহাড়ের কাছে এসে পড়ল—সেটা কুকুরই বটে।

কুমার বলে উঠল, নিশ্চয়ই আমার বাঘা! বলেই সে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল, আমরাও তার পিছনে পিছনে চললুম।

কুমার চেঁচিয়ে ডাক দিলে, বাঘ, বাঘ, বাঘা।

কুকুর পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘেষে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু কুমারের ডাক শুনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরে খুব জোরে চীৎকার করতে করতে তীরের মতন বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। হ্যাঁ, এ যে বাঘ, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

বাঘা ছুটে এসে একেবারে কুমারের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল, কুমার মহানন্দে তাকে নিজের কোলের ভিতরে টেনে নিলে।

আমি দেখলুম, বাঘার গলা থেকে একগাছা সোনার শিকলের আধখানা ঝুলছে। বাঘ নিশ্চয়ই শিকল ছিড়ে পালিয়ে এসেছে।

বাঘা তারপর বিমল, রামহরি, কমল ও আমার কাছেও এসে ল্যাজ নেড়ে মনের খুসি জানালে ও আমাদের গা চেটে দিয়ে বা পায়ের কাছে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে সকলকে বুঝিয়ে দিলে যে, তার নূতন আর পুরাতন কোন বন্ধুকেই সে ভুলে যায়নি।

বাঘাকে ফিরে পেয়ে আমাদেরও কম আনন্দ হল না। এই নূতন জগতে এসে পৃথিবীর সমস্তই আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠছে, কুকুর বলে বাঘাকে আর ছোট ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছে না। উড়োজাহাজে যে বানরদের দেখেছিলুম, তারাও যদি কোন গতিকে আসতে পারে, তাহলে তাদেরও আমি আদর করে আশ্রয় দিতে নারাজ হই না। তারাও যে পৃথিবীর জীব, আমাদের প্রাণের সঙ্গে তাদেরও যে যোগ আছে।

বামনদের আস্তানায়

সন্ধ্যা উৎরে গেছে। আকাশের দুই চাঁদ যেন পরস্পরকে দেখে হাসতে সুরু করে দিয়েছে—যদিও তাদের হাসির ক্ষীণ আলো চারিদিকের আবছায়া দূর করতে পারছে না।

আমরা একে একে পাহাড় থেকে মরুভূমিতে এসে নামলুম, তারপর সকলে মিলে যাত্রা করলুম বামনদের শহরের দিকে। সব-আগে রইল বন্দুক নিয়ে বিমল ও কুমার, তারপর আমি, কমল ও রামহরি, তারপর আর সকলে। বিমল ও কুমারের পকেটে দু'খানা বড় ছোরা ছিল, আমি আর কমল সে দুখান চেয়ে নিলুম। অন্য সকলে বন থেকে গাছের এক-একটা মোটা ডাল ভেঙে নিলে—দরকার হলে তা দিয়ে বামন বধ করা কিছুমাত্র শক্ত হবে না। মানুষের হাতের অমন লম্বা ও মোটা ডালগুলোর কাছে বামনদের ক্ষুদে তরোয়ালগুলো একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এক-এক লাফে আমরা খাল পার হয়ে গেলুম। আমাদের দেখাদেখি বাঘাও লাফিয়ে খাল পার হল—মঙ্গলে এসে তারও লাফ মারবার ক্ষমতা আশ্চর্যরকম বেড়ে গেছে।...

বারবার লাফ মেরে অগ্রসর হলে পাছে হাঁপিয়ে পড়ি, সেই ভয়ে আমরা পায়ে হেঁটেই এগুতে লাগলুম। আর বেশী তাড়া করবারই বা দরকার কী, আমাদের সামনে এখন সারা রাত্রিটাই পড়ে রয়েছে। ঘণ্ট-আড়াই পরে দূর থেকে বামনদের শহর আবছায়ার মত দেখা গেল। শহরটা দেখেই বাঘা রেগে গরর-গরর করে উঠল, কিন্তু কুমার তখনি তার মাথায় এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললে, 'খবর্দার বাঘা, চুপ করে থাক। বাঘা একেবারে চুপ হয়ে গেল, তারপর একবারও সে টু শব্দটি পর্যন্ত করলে না। আশ্চর্য কুকুর।

শহরের ভিতরে মাঝে মাঝে আলো দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু জনপ্রাণীর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বামনরা বোধহয় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আচম্বিতে বিমল ও কুমার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি বললুম, ব্যাপার কী? বিমল সামনের দিকে আঙুল তুলে দেখালে। তাই তো, প্রকাণ্ড একটা ছায়ার মত, অনেকখানি জায়গা জুড়ে কী ওটা পড়ে রয়েছে।

বিমল চুপি চুপি বললে, বিনয়বাবু, উড়োজাহাজ!

কুমার বললে, বোধহয় এইখানাই আমাদের পৃথিবীতে গিয়েছিল।

আমি বললুম, হুঁ', এর আকার দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে। এখান নিশ্চয় পৃথিবী আক্রমণ করতে যাবে বলে বিশেষভাবে তৈরি হয়েছিল, কারণ মঙ্গলের আর যত উড়োজাহাজ দেখেছি সবই ছোট ছোট। কিন্তু এখান এমন খোলা জায়গায় পড়ে কেন?

বিমল বললে, বোধহয় শহরের ভিতরে এতবড় উড়োজাহাজ রাখবার জায়গা নেই।

বিমলের অনুমান সত্য বলেই মনে হল ।...আমি নীরবে ভাবতে লাগলুম।

বিমল বললে, এখন আমাদের কী করা কর্তব্য?

ধাঁ করে আমার মাথায় এক ফন্দি জুটে গেল।. এর আগে এমন ফন্দি আমার মাথায় ঢোকেনি কেন, পরে তাই ভেবে আমি নিজের বুদ্ধিকে যথেষ্ট ধিক্কার দিয়েছি, কারণ তাহলে আজ আমাদের মঙ্গল গ্রহে হয়ত আসতেই হত না। আমি বিমলকে বললুম, দেখ, এই উড়োজাহাজখানা আমরা যদি আক্রমণ করি, তাহলে কী হয়?

বিমল বললে, এ প্রস্তাব মন্দ নয়। উড়োজাহাজের ভিতরে হয়ত অনেক রসদ আছে। তাতে আমাদের পেটের ভাবনা দূর হতে পারে।

আমি বললুম, কিন্তু খুব চুপি চুপি কাজ সারতে হবে। কারণ শহরের লোক জানতে পারলে আমাদের পক্ষে আত্মরক্ষণ করা শক্ত হয়ে উঠবে।

বিমল বললে, দাঁড়ান, আগে আমি দেখে আসি।

বিমল হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। আমরা স্তব্ধ হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

খানিক পরে বিমল ফিরে এসে বললে, আক্রমণের কোনই বাধা নেই। উড়োজাহাজের প্রধান দরজাটা খোলা রয়েছে। সিঁড়ির উপরে বসে একজন বামন-সেপাই ঢুলছে, আমি এখনি এমনভাবে চেপে ধরব, যাতে সে কোন গোলমাল করতে পারবে না। আপনার চুপি চুপি আমার পিছনে আসুন।

বিমল আবার হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হল, আমরা সকলেও ঠিক সেইভাবেই তার পিছু নিলুম।

খানিক দূর অগ্রসর হয়েই দেখলুম, উড়োজাহাজের ভিতর থেকে খোলা দরজা দিয়ে একটা আলোর রেখা বাইরে এসে পড়েছে। দরজার তলাতেই নিচে নামবার জন্যে সিঁড়ি, ঠিক তার উপর-ধাপে পা ঝুলিয়ে এবং উড়োজাহাজের গায়ে ঠেসান দিয়ে বসে আছে এক বামন-সেপাই।

আমাদের অপেক্ষা করতে বলে বিমল বুকে হেঁটে আরো খানিক এগিয়ে গেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চোখের পলক ফেলতে নাফেলতে সে মারলে এক লাফ এবং সিঁড়ি টপকে পড়ল গিয়ে একেবারে সেই বামন-সেপাইয়ের বুকের উপরে। তারপর কী হল তা জানি না, কিন্তু বামনটার মুখ থেকে কোনরকম আর্তনাদই আমাদের কানে এসে বাজল না। অল্পক্ষণ পরেই বিমল উঠে দাঁড়াল এবং হাতছানি দিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে বললে।

জয়, জয়, জয়

বামনদের বাগে আনতে আমাদের বেশী বেগ পেতে হল না। একেই তো তারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিল, তার উপরে তারা অস্ত্র ধরবার সময় পর্যন্ত পেলে না। অস্ত্রগুলো আমরা আগেই কেড়ে নিলুম, তারপর তাদের সবাইকে ভেড়ার পালের মত তাড়িয়ে একটা ঘরের ভিতরে পুরে ফেললুম এবং ইশারায় জানিয়ে দিলুম যে, দুষ্টুমি করলে তারা কেউ প্রাণে বাঁচবে না।

বামনদের দলে লোক ছিল মোট আশি জন। মানুষের তুলনায় তারা এত দুর্বল যে, আমরা ইচ্ছা করলেই তাদের সবাইকে টিপে মেরে ফেলতে পারতুম।

একটা বামন চেঁচিয়ে গোলমাল করে উঠেছিল। কিন্তু কুমার তখনি তাকে খেলার পুতুলের মত মাটি থেকে তুলে মারলে এক আছাড়। তাকে হত্যা করবার ইচ্ছা কুমারের মোটেই ছিল না, কিন্তু সেই এক আছাড়েই বেচারির ভবের লীলাখেলা সাঙ্গ হয়ে গেল একেবারে। লঘু পাপে গুরু দণ্ড।

আমরা দুঃখিত হলুম, কিন্তু হাতে হাতে এই কঠোর শাস্তি দেখে অন্যান্য বামনরা দস্তুরমত চিট হয়ে গেল—সবাই বোবার মত চুপ করে রইল ।

বিমল বললে, বিনয়বাবু, এইবারে এদের ভাড়ার ঘরে ঢুকে রসদটসদ যা আছে লুটপাট করে নেওয়া যাক।

আমি বললুম, না, এইবারে আবার পৃথিবীর দিকে যাত্রা করা যাক।

বিমল, কুমার ও কমল একসঙ্গে বললে—পৃথিবীর দিকে যাত্রা! রামহরি এত আশ্চর্য হয়ে গেল যে, প্রকাণ্ড হাঁ করে আমার মুখের পানে শুধু তাকিয়ে রইল –একটা কথা পর্যন্ত কইতে পারলে না।

আমি বললুম, হ্যাঁ, এইবারে আমাদের পৃথিবীতে ফিরতে হবে, নইলে শীঘ্র আর ফেরবার সময় পাওয়া যাবে না ; কারণ এখনো মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর কাছেই রয়েছে—যতই দেরি করব, ততই সে দূরে চলে যাবে।

কমল বললে, কিন্তু যাব কী করে? আমাদের তো ডানা নেই?

আমি বললুম, যেমন করে এসেছি, তেমনি করেই যাব—অর্থাৎ এই উড়োজাহাজে চড়ে।

বিমল বললে, বিনয়বাবু, আপনি বোধহয় মনের খুসিতে ভুলে গেছেন যে আমরা কেউই এ উড়োজাহাজ চালাতে জানি না।

আমি বললুম, না, আমি কিছুই ভুলিনি। উড়োজাহাজখানা দেখেই আমার মাথায় এই নতুন ফন্দি জুটেছে। আমরা পৃথিবীতেই যাব, আর এই উড়োজাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে ঐ বামনরাই।

বিমল সানন্দে এক লম্ফ ত্যাগ করে বললে, ঠিক, ঠিক ! এতক্ষণে আমি বুঝেছি। বামনদের আমরা জোর করে আমাদের সারথি করব—কেমন, এই তো?

আমি বললুম, হ্যাঁ। বামনরা এখন দলে হালকা হয়ে পড়েছে, সেপাইরা সব শহরে আছে। এই হচ্ছে শুভ মুহূর্ত, প্রাণের ভয়ে ওরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রস্তাবে রাজি হবে।

বিমল আনন্দে অধীর হয়ে বললে, জয়, বিনয়বাবুর বুদ্ধির জয়! কুমার আমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে গদগদ স্বরে বললে, বিনয়বাবু, বিনয়বাবু, তাহলে আবার আমরা পৃথিবীতে ফিরতে পারব?

কমল আর রামহরি পরস্পরের হাত ধরে অপূর্ব এক নৃত্য স্বরু করে দিলে। তাদের দেখাদেখি বাঘারও স্ফুর্তি বেড়ে উঠল, সেও লাফিয়ে লাফিয়ে হরেকরকম নাচের কায়দা দেখাতে লাগল, আর এত জোরে ল্যাজ নাড়তে লাগল যে, আমার মনে হল ল্যাজটা বুঝি এখনি ছিড়ে ঠিকরে পড়বে।

অন্যান্য সকলেও নানাভাবে ও নানা ভঙ্গীতে আপন আপন মনের আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

আমি বললুম, এখনি এতটা আহলাদ করে কোন লাভ নেই। আগে দেখ আমরা সত্যিই পৃথিবীতে গিয়ে পৌছতে পারি কিনা। তার উপরে বামনরা উড়োজাহাজ চালাতে রাজি হবে কিনা, এখনো তাও আমরা জানি না।

বিমল চোখ পাকিয়ে বললে, কী। রাজি হবে না? তাহলে ওদের কারুকেই আমি আর আস্ত রাখব না –বলেই বন্দুক বাগিয়ে সে বামনদের দিকে অগ্রসর হল। আমরাও সদলবলে তার পিছনে পিছনে চললুম।

যে-কয়জন বামন উড়োজাহাজের কলঘরে থাকত, পৃথিবী থেকে আসবার সময়ে আমরা তাদের অনেকবার দেখেছিলুম। তাদের পোশাক সেপাইদের পোশাকের মতন নয়। সেই পোশাক দেখেই বিমল তাদের একে-একে দল থেকে টেনে বার করলে । তারা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

উড়োজাহাজের কলঘর আমরা আগে থাকতেই জানতুম। বিমল ইঙ্গিতে তাদের সেদিকে অগ্রসর হতে বললে তারা মুড়-সুড় করে বিমলের আগে আগে চলতে লাগল!

কুমার ও আরো জন পনেরো লোককে বাকি বামনদের কাছে পাহারায় নিযুক্ত রেখে আমিও কলঘরের দিকে চললুম। উড়োজাহাজের প্রধান দরজা অনেক আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ।

সবাই কলঘরে গিয়ে ঢুকলুম। মস্ত ঘর। চারিদিকে নানান রকম যন্ত্র রয়েছে—ছোট, বড়, মাঝারি। সমস্ত যন্ত্রই পাকা সোনার তৈরী।

কমল বললে, বিনয়বাবু, এই উড়োজাহাজে এত সোনা আছে যে, আমরা সবাই বড়লোক হয়ে যেতে পারি।

আমি বললুম, রও, আগে প্রাণে বেঁচে মানে মানে পৃথিবীতে ফিরে যাই, তারপর সোনাদানার কথা ভাবা যাবে-খন ! এখন এ সোনার কোনই দাম নেই।

বিমল কলের দিকে আঙুল দেখিয়ে ইসরায় বামনদের কল চালাতে বললে। বিমলের ইসারা ও উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বামনদের মুখ শুকিয়ে গেল। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত পরস্পরের মুখচাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

বিমল ক্রুদ্ধভাবে আবার ইসারা করলে। কিন্তু বামনরা তবুও যন্ত্রের দিকে এগুল না। বিমল তখন বন্দুকটা তুলে বামনদের দিকে এগিয়ে গেল। বন্দুক দেখেই তারা আঁৎকে উঠল, তারপর তীরের মত ছুটে গেল —যন্ত্রপাতির দিকে। আর কারুকে কিছু বলতে হল না। এমনি বন্দুকের মহিমা!

উড়োজাহাজ উপরে উঠতে লাগল—ধীরে, ধীরে, ধীরে। বিপুল পুলকে আমিও আর চুপ করে থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলুম,—'জয়, পৃথিবীর জয়।—আমার জয়নাদে অন্য সকলেও যোগ দিলে। সে যে কী আনন্দ, লিখে তা জানানো যায় না। ' উড়োজাহাজ আরো উপরে উঠল—আরো—আরো উপরে। স্বচ্ছ কক্ষতল দিয়ে দেখতে পেলুম, নিচে শহরের চারিদিকে বড় বড় আলো জ্বলে উঠেছে। নিশ্চয়ই উড়োজাহাজের শব্দে শহরের ঘুম ভেঙে গেছে। হয়ত এখনি শত-শত উড়োজাহাজ আমাদের আক্রমণ করতে আসবে।

বিমল ইসারায় বারংবার শাঁসিয়ে বলতে লাগল, উড়োজাহাজের গতি বাড়াবার জন্যে ।...বামনরা কল টিপে উড়োজাহাজখানাকে ঠিক উল্কার মত বেগে চালিয়ে দিলে, দেখতে দেখতে শহরের আলোগুলো ঝাপসা হয়ে এল। আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম, কারণ শহরের উড়োজাহাজগুলো প্রস্তুত হবার আগেই আমরা বোধহয় নাগালের বাইরে চলে যেতে পারব। বিশেষ, আমাদের উড়োজাহাজের আকার যে-রকম বিশাল, তাতে এর সঙ্গে আর কোন উড়োজাহাজ পাল্লা দিতে পারবে বলে মনে হয় না !

শহরের খুব অস্পষ্ট আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে আমি বললুম-বিদায় মঙ্গল গ্রহ, তোমার কাছ থেকে চির বিদায়! তোমার রক্ত-মরুভূমির কাছ থেকে, তোমার যুগল চন্দ্রের কাছ থেকে, তোমার অপূর্ব জীব-রাজ্যের কাছ থেকে

আজ আমরা চির-বিদায় গ্রহণ করলুম। তোমার অনেক রহস্যই হয়ত জানা হল না, কিন্তু যেটুকু দেখবার সুযোগ পেয়েছি, এ-জীবনের পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট, তোমাকে ভালো করে জানবার জন্যে আর আমার কোনই আগ্রহ নেই। পৃথিবীর ডাক আমাদের কানে এসে পৌছেছে—বিদায় মঙ্গল গ্রহ, চির-বিদায়!

আবার পৃথিবীতে

সব কথা আর খুটিয়ে না বললেও ক্ষতি নেই। কারণ আসবার মুখে আজ পর্যন্ত আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি।

বামনদের উপরে আমরা পালা করে দিন-রাত পাহারা দিয়েছি, কাজেই তারাও বাধ্য হয়ে বরাবর উড়োজাহাজ চালিয়ে এসেছে ।

সোনার পৃথিবী এখন আমাদের চোখের উপরে ছবির মতন ভাসছে। দেখতে দেখতে আমাদের চোখ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে ।

আমরা পৃথিবীর কোন দেশে গিয়ে নামব, তা জানি না। কিন্তু যেখানেই নামি, আমাদের ইতিহাস নিয়ে যে সারা পুথিবীতে একটা মহা আন্দোলনের সূত্রপাত হবে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। আমাদের মুখের কথায় নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাস করত না; কিন্তু এই অদ্ভূত উড়োজাহাজ আর বামনদের স্বচক্ষে দেখলে আর কেউ সন্দেহ করবার ওজরটুকু পর্যন্ত তুলতে পারবে না।

বামনরা এসেছিল পৃথিবী থেকে নমুনা জোগাড় করতে। আমরাও আজ মঙ্গল থেকে অনেক বিচিত্র নমুনা নিয়ে ফিরে আসছি। শুধু নমুনা সংগ্রহ নয়,—আমরা ফিরছি মঙ্গলকে জয় করে। মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব যে মঙ্গলে নেই, আমরা তা প্রমাণিত করেছি।

কিন্তু এ কী মুস্কিল! শেষটা কি ঘাটে এসে নৌকো ডুববে? আমরা যখন পৃথিবীর খুব কাছে, আমাদের সকলেরই মুখে যখন নিশ্চিত হাসির লীলা, চোখে যখন নির্ভয় শান্তির আভাস, তখন চারিদিক অন্ধকার করে আচম্বিতে ঝড়ের এক ভৈরব মূর্তি জেগে উঠল ।

তেমন ঝড় আমি জীবনে কখনো দেখিনি। আমাদের এমন যে প্রকাণ্ড উড়োজাহাজ, ঠিক যেন ছেড়া পাতার টুকরোর মতন ঝোড়ো হাওয়ার মুখে ঘুরতে

যুবতে উড়ে চলল। কোন রকমেই সে বাগ মানলে না। প্রতি মুহুর্তেই মৃত্যু যেন আমাদের চোখের উপরে মৃত্য করতে লাগল।.

প্রায় চার ঘণ্টা ধরে আমাদের উড়োজাহাজ নিয়ে দিকে দিকে ছোড়াছুঁড়ি করে ঝড়ের শখ যেন মিটল। ধীরে ধীরে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস থেমে আসতে লাগল, কিন্তু চারিদিকের নিবিড় অন্ধকার তখনে একটুও কমল না। এ অন্ধকারে পৃথিবীতে নামাও নিরাপদ নয়।

অথচ আমরা নামতে না চাইলেও, উড়োজাহাজ যে ধীরে ধীরে নামছে, সেট,বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারলুম। বামনরা চেষ্টা করেও তাকে আর উপরে তুলতে পারছে না –নিশ্চয়ই ঝড়ের দাপটে কোন কল-কব্জা বিগড়ে গেছে।

তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে, উড়োজাহাজখানা আস্তে আস্তে নামছে। নইলে পৃথিবীর উপরে আছড়ে পড়ে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, আমাদেরও আর কিছু আশা-ভরসা থাকত না ।

কিন্তু কোথায় আমরা নামছি—জলে, না স্থলে? অন্ধকারে কিছুই বোঝবার জো নেই।

যেখানেই নামি, এ যে আমাদের নিজেদের পৃথিবী, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। এ একটা মস্ত সান্তনা। মা-পৃথিবীর সবুজ বুক স্পর্শ করবার জন্যে প্রাণ আমার আনচান করতে লাগল। হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে উড়োজাহাজ স্থির হয়ে দাঁড়াল । আমরা আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছি ! আমরা সকলে মিলে জয়ধ্বনি করে উঠলুম এবং তাই শুনে বামনরা যেন আরো মুষড়ে পড়ল।

উড়োজাহাজের দরজা খুলে আমি বাইরের দিকে তাকালুম। একে রাত্রি, তায় আকাশ মেঘে ঢাকা। কাজেই দেখলুম, খালি অন্ধকার আর অন্ধকার আর অন্ধকার ।

রাত না পোয়ালে কিছুই দেখবার উপায় নেই। আমরা সাগ্রহে প্রভাতের অপেক্ষায় বসে রইলুম। খোল। দরজা দিয়ে মাঝে মাঝে দমকা বাতাস এসে

আমাদের সঙ্গে আলাপ করে যাচ্ছিল। এ বাতাসকে আমি চিনি। এ আমাদের পৃথিবীর বাতাস। তাকে কি ভোলা যায়?

ঐ ফুটে উঠেছে ভোরের আলো-পুব আকাশের তলায় আশার একটি সাদা রেখার মত। আকাশের বুকে তখনও রাতের কালো ছায়া ঘুমিয়ে আছে এবং সামনের দৃশ্য তখনো অন্ধকারের আস্তরণে ঢাকা। তবে, অন্ধকার এখন অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে বটে।

মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, পৃথিবীর সমস্তই আবছায়ার মতন, — এখনো গাছপালার সবুজ রঙ চোখের উপরে ভেসে ওঠেনি।

বিমল, কুমার, কমল ও রামহরি আর থাকতে পারলে না, তারা তখনি উড়োজাহাজ ছেড়ে নেমে পড়ল। আমিও নিচে নামলুম— বাঘাও আমাদের সঙ্গ ছাড়লে না।

আম, কী আরাম! এতকাল পরে পৃথিবীর প্রথম স্পর্শ, সে যে কী মিষ্টি! মাটিতে পা দিয়েই টের পেলুম, আমরা স্বদেশে ফিরে এসেছি।

কমল তড়াক করে এক লাফ মেরে বললে, 'হ্যাঁ, এ পৃথিবীই বটে! এক লাফে আমি আর তিন-তলার সমান উঁচু হতে পারলুম না তো!

খানিক তফাতে হঠাৎ কি একটা শব্দ হল—ছড়ম, ছড়ম, ছডডুম! যেন ভীষণ ভারি পায়ের শব্দ।

আমরা সচমকে সামনের দিকে তাকালুম। অন্ধকারের আবরণ তখনো সরে যায়নি, তবে একটু দূরে প্রকাণ্ড একটা চলন্ত পাহাড়ের কালো ছায়ার মত কি যেন চলে যাচ্ছে বলে মনে হল ।

আমরা সবাই স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

বাঘা ভয়ানক জোরে ডেকে উঠল, আমরা সবাই স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

নিজের চোখকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে বলতে পারি, আমাদের সুমুখ দিয়ে যে জীবটা চলে যাচ্ছে, সেটা তালগাছের চেয়ে কম উঁচু হবে না। তার পায়ের তালে, দেহের ভারে পৃথিবীর বুক ঘন-ঘন কেঁপে উঠছে।

মহাকায় জীবটা কোথায় মিলিয়ে গেল, কিন্তু তার চলার শব্দ তখনো শোনা যেতে লাগল-হড়ুম, হুড়ুম, হুড়ুম।

বিমল শুষ্ক স্বরে বললে, বিনয়বাবু!

অ্যাঁ? ওটা কী?

অন্ধকারে তো কিছুই দেখতে পেলুম না।

কিন্তু যেটুকু দেখলুম, তাই-ই কি ভয়ানক নয়! এ আমরা কোথায় এলুম?

পৃথিবীতে। কিন্তু এইমাত্র যাকে দেখলুম, সে কি পৃথিবীর জীব? আমিও অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম। ওদিকে আকাশের কোলে শুয়ে উষার চোখ ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল।